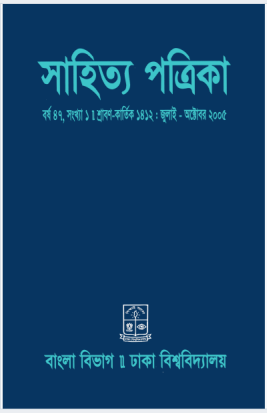

Vol. 47 | No. 1 | 2005

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ইবসেন, নারীবাদ ও নোরা

Volume	47
Issue	1
Year	2005
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাসুদুজ্জামান
Published online	October 1, 2005
DOI	10.62328/sp.v47i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i1.2
Pages	২৯-৪৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ইবসেন, নারীবাদ ও নোরা

মাসুদুজ্জামান*

My book is poetry, and if it is not poetry, then it will be.

-- Henrik Ibsen.

বিশ্বসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হেনরিক ইবসেনের (১৮২৮-১৯০৬) *আ ডলস্ হাউজ* (১৮৭৯)।[১] নোরা হেলমার চরিত্রকে ঘিরেই এর যত খ্যাতি। শেক্সপীয়রের কালজয়ী নাটকের চরিত্রগুলোর পরে আর কোনো নাট্যচরিত্র নিয়ে এতটা আলোড়ন তৈরি হয় নি। শেক্সপীয়র তাঁর নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাস থেকে। অন্যদিকে সমকালীন মানুষের জীবনযাপন ছিল ইবসেনের নাট্যকাহিনীর উৎস। ইবসেনকে তাই বলা হয় ইউরোপীয় বাস্তববাদী নাট্যধারার জনক। লক্ষ করলে দেখা যাবে নোরা চরিত্রের মাধ্যমেই এই বাস্তবতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছিল। নোরা এমনই এক সৃষ্টি, কালের পরম্পরায় যার আবেদন এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। *আ ডলস্ হাউজ* নাটকের একেবারে শেষে নোরা তার স্বামীর বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেই যে পথে বেড়িয়ে পড়েন, মনে করা হয় সেটাই ছিল নারীমুক্তির সরণি, অচির কালের মধ্যে যার সূত্র ধরে দেশে দেশে নারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত আর জয়ী হতে থাকে। ইবসেন অবশ্য নিজে একে নারীমুক্তি না বলে 'মানবমুক্তি' বলেই উল্লেখ করেছেন। মহান শিল্পীর মহৎ উক্তিই বটে ! নারীবাদীরা এখন তো একথাই বলছেন, নারীমুক্তি মানে মানবমুক্তিই। কিন্তু ইবসেন তাঁর *আ ডলস্ হাউজ*কে নারীবাদের প্রচারপত্রে পরিণত করেন নি। নোরাও হয়ে ওঠে নি সেই প্রচারণার মুখপাত্র। শিল্পের দায় মিটিয়েই ইবসেন তাঁর এই নাটকটি রচনা করেন। নোরা

---

* সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; বর্তমানে ছুটি নিয়ে তাইওয়ানের চিং ইউম বিশ্ববিদ্যায়ের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

একারণেই দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে চিরায়ত হয়ে উঠতে পেরেছে। নারী হিসেবেই তার মানবিক সংগ্রাম উপজীব্য হয়েছে *আ ডলস্ হাউজ* নাটকে।

সাহিত্যে নারীভাবমূর্তি নারীবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।[২] কিন্তু ইবসেন শুধু এই ভাবমূর্তি নয়, নারীবাদকেই *আ ডলস্ হাউজ* নাটকের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। সাহিত্যে নারীকে পারিবারিক-সামাজিক পরিমণ্ডলে যে ভূমিকায় দেখানো হয়, সেই ভূমিকা বিচার বিশ্লেষণ করেই সমালোচকেরা কোনো বিশেষ রচনা নারীমুক্তি বা মানবমুক্তির ইশারা দেয় কিনা, তা বিবেচনা করে থাকেন। বিশেষ করে নারীর সনাতন পারিবারিক ভূমিকা — যেমন, কন্যা, ভগ্নি, প্রেমিকা, স্ত্রী আর মা হিসেবে নারীকে সাহিত্যে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সে সব বিবেচনা করাই নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য। মনে করা হয়, এই সমালোচনার মাধ্যমেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখকের বদ্ধ বা মুক্তদৃষ্টির (যার মূল কথা নারী-পুরুষের সমতা, ন্যায্যতা, সমানাধিকার ইত্যাদি) পরিচয় উদঘাটিত হয়। দাম্পত্য জীবনে সমতা, সম্পদের উপর স্বত্ব, দায়িত্ববোধ ও দায়িত্ব পালন, কাজের অধিকার ইত্যাদি নারী-পুরুষের একই রকম কি-না সাহিত্যে নারীবাদীরা এসবেরই অনুসন্ধান করে থাকেন। বিশেষ করে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রধান সূত্র — সংঘাতমূলক পুরুষালি এবং নারীত্বসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যে কীভাবে, কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, নারীবাদী সাহিত্য সমালোচকেরা সেটাই দেখতে চেয়েছেন।[৩] এসব দিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে *আ ডলস্ হাউজ* থেকে *ঘোস্ট* বা *হেড্ডা গ্যাবলার* পরম্পরিত পরিপূরক নাটক, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে নানাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। *ঘোস্ট* নাটকে যেখানে নৈতিক দিক থেকে নারী পুরুষতন্ত্রের শিকার হয়, সেখানে *হেড্ডা* অন্য অনেক নায়িকার মতো পরিস্থিতির শিকার হয়ে শুধু নিজের প্রতি দায়িত্ববোধের কারণে নিজের এবং অন্যদেরও সর্বনাশ ডেকে আনে। নোরার ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্র যে পুরুষের স্বার্থে নারীদের কীভাবে গৃহের অভ্যন্তরে আটকে দিয়ে তার আত্মবিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়, তার সর্বজনীন ছবি পাওয়া যায়।

নোরার কাহিনী, বলাবাহুল্য, একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নারী-পুরুষের সম্পর্কের গ্রন্থিমোচন এবং আত্মআবিষ্কারের মধ্য দিয়ে নোরার যে ব্যক্তিক আত্মোপলব্ধি আর মানবিক আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটে, সেটাই এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। পুরুষতন্ত্রের জাল ছিন্ন করেই মানবিক হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু এর পেছনে কি ইবসেনের নারীবাদী ভাবনা সক্রিয় ছিল কিংবা ইবসেন কি নারীবাদী ছিলেন ? সেকাল থেকে একাল — এই প্রশ্নে *আ ডলস্ হাউজের* সমালোচকেরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ইবসেন বেঁচে থাকতেও তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে। ১৮৯৮ সালের ২৬ মে নিজের সত্তরতম

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত নরওয়েজিয়ান উইমেন রাইটস্ লিগের ভোজসভায় ইবসেন এ প্রসঙ্গে বলেন :

> I thank you for the toast, but must disclaim the honor of having consciously worked for the women's rights movement. ... True enough, it is desirable to solve the woman problem, along with all the others; but that has not been the whole purpose. My task has been the description of humanity.[৪]

এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলাবাহুল্য যে, কুড়ি বছর আগে ইবসেনের *আ ডলস্ হাউজ* নাটকটি রচনার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল, তা ব্যাখ্যা করা হয়। ইবসেনের দুনিয়াখ্যাত সমালোচক ও জীবনীকার মরিস ভ্যালেন্সি, মাইকেল মেয়ার, জেমস ম্যাকফারলেন নোরাকে কেন্দ্র করে ইবসেন যে নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ ঘটান নি, বার বার তা বলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নোরার চরিত্রের বিকাশ এবং *আ ডলস্ হাউজ* রচনার পূর্বাপর ইতিবৃত্ত লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তাঁদের ধারণা আংশিক সত্য, মূল সত্য নয়।

কোনো সন্দেহ নেই ইবসেন নারীবাদী প্রচারপত্র লেখেন নি, লিখেছেন নাটক। ফলে নোরার যে দ্বন্দ্ব তা নারীর সাধারণ দ্বন্দ্বের চেয়েও আরও অনেক গভীর। কিন্তু অনেকেই এর তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেন নি। ইবসেনের মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পর (১৯৫৭) একজন সমালোচক লিখছেন, নোরার সংকটের সঙ্গে "নারী-পুরুষের সম্পর্কের কোনো সম্বন্ধ নেই"। এই নাটকে "একজন নারী কী করে ব্যক্তি হয়ে উঠলো"[৫] সেকথাই বলা হয়েছে। এর আরও কুড়ি বছর পর, নারীবাদ যখন আন্তর্জাতিক আন্দোলনের রূপ নিয়ে ফেলেছে, মার্কিন-স্ক্যান্ডেনেভীয় সাহিত্যের প্রথিতযশা সমালোচক এইনার হাউজেন লিখলেন :

> Ibsen's Nora is not just a woman arguing for female liberation; she is much more. She embodies the comedy as well as the tragedy of modern life.[৬]

এরও বেশ কয়েক বছর পর মার্কিন সমালোচক ইভোনে শেফার নোরার চরিত্রকে শুধু নারীবাদের দ্বারা সংকীর্ণ করে ফেলা হয় বলে তার সমালোচনা করেন।[৭] এলাইন হোফমান এরই প্রেক্ষাপটে বলেছেন যে, ইবসেনের এই নাটক "আমাদের সময়ের মীথকে ধারণ করে আছে।" তিনি নোরার চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীবাদের সর্বোচ্চ রূপ প্রকাশ পেলেও নাটকটিকে নারীবাদী নাটক বলতে চান নি। প্রখ্যাত ব্রিটিশ নাট্যকার

বার্নাড শ'য়ের মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ইবসেনকে "মানবাত্মার সত্যনিষ্ঠ কবি" বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমালোচক রবার্ট ক্রসটেইন নোরাকে অবশ্য আরও চমকপ্রদ এক বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন । তিনি মনে করেন নোরার মধ্য দিয়ে নারীর প্রশ্ন খুব বড়ো করে দেখেন নি ইবসেন। বরং নোরা হচ্ছে "ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীক"। ইবসেনের প্রখ্যাত জীবনীকার হ্যাল্‌ভডান কোত শেষ পর্যন্ত নোরা সম্পর্কে তাই এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে, নারী সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক নয়, "শিল্প আর মানবিক সম্পর্কই" এই নাটকের মূল বিষয়। এসব সমালোচনা, বলাবাহুল্য যে, নারী হিসেবে নোরার সংগ্রামকে অনেক ছোট করে দেখেছে। নোরা প্রথমে নারী, তারপরে কীভাবে তার মধ্যে মানবসত্তার স্ফুরণ ঘটলো, কীভাবে তার চরিত্রটি মানবিক হয়ে উঠলো, সেসব লক্ষ করা যেতে পারে। তার নারীসত্তাকে অগ্রাহ্য করে মানবসত্তার ব্যাখ্যা তাই অপব্যাখ্যারই নামান্তর বলা যেতে পারে।

কিন্তু বেশ কিছু সমালোচক নারী হিসেবে নোরার সত্তাকে শুধু অগ্রাহ্য নয়, নিন্দামন্দ করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁকে আত্মকেন্দ্রিক, অস্বাভাবিক, খ্যাপাটে, হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত নারী বলেও চিহ্নিত করেছেন তাঁরা। সমকালের রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটা অংশও নোরার পরিণামকে মেনে নিতে পারে নি। বিশেষ করে *আ ডলস্ হাউজের* শেষাংশ সম্পর্কে তাঁদের প্রবল আপত্তি যেখানে নোরা স্বামী ও সন্তানদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। ফলে নোরা নয় তাঁর স্বামী টোরভাল্ডই দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ইবসেন মূলত এরই চাপে এই নাটকের শেষাংশের নানা পরিবর্তন ঘটান। বিকল্প পাঠ দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজ নয়, শেষ পর্যন্ত শিল্পের জয় হয়। ফলে এসব চেষ্টার পর চূড়ান্ত পরিমার্জন শেষে নাটকটি যখন মঞ্চায়িত হতে থাকে তখন খোদ নরওয়ে তো বটেই, জার্মানি, ইংল্যান্ড, অর্থাৎ পুরো ইউরোপ জুড়ে সাড়া পড়ে যায়। এমন কি আমেরিকা ও জাপানেও তার ঢেউ এসে লাগে।

ইবসেন শুধু পরিবারতন্ত্রের ধ্বংস নয়, ঈশ্বরবিরোধী নৈতিকতার অবনতি ঘটিয়েছেন বলেও এই নাটকের মূল বক্তব্যকে রক্ষণশীলরা নাকচ করে দিতে চেয়েছেন। নোরার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো আক্রমণটা করা হয় নৈতিকতার মানদণ্ডে। ফ্রয়েডবাদের (ফ্রয়েডের নারী-পুরুষ সম্পর্কিত তত্ত্ব) আবির্ভাবের আগে তাঁকে অনৈতিক, লোভী, মিথ্যেবাদী, স্বার্থপর, ভালোবাসা পাওয়ার অযোগ্য নারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু ফ্রয়েডবাদের পরে তাঁকে 'অস্বাভাবিক', 'অপরিপক্ব', 'পাগলাটে', 'ছিটগ্রস্ত' বলে অ্যাখ্যায়িত করা হয়। নোরা স্বাভাবিক কোনো নারী নয় বলেই অনেকে মত প্রকাশ করেন। ফলে নোরা একশ্রেণীর সমালোচকের কাছে এই নাটকের 'নায়িকা' আর নারীবাদের প্রতিনিধি হবার উভয় যোগ্যতাই হারান। সমালোচকেরা অবশ্য

নোরাকে এরকম তীব্রভাবে আক্রমণ করলেও তাঁর অভিঘাত অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। বিশেষ করে নারীদের কাছে নোরার গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। নোরাকে নিন্দার যত বিশেষণেই আক্রমণ করা হোক না কেন, এই চরিত্রটি সমকালের নারী ও পুরুষদের মধ্যে নতুন কালের নতুন মানবিক সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে।

সমকালের বিভিন্ন সমালোচক, যারা *আ ডলস্ হাউজকে* অগ্রাহ্য করতে পারেন নি, তাঁরা এই নাটকটি নোরার "মানবিক" হয়ে ওঠার কাহিনী বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে মানবিকতার ব্যাপারটি তো নারী-পুরুষ যে-কারো ক্ষেত্রেই হতে পারে। এখানে সেক্সের (নারী ও পুরুষের শারীরিক পার্থক্য) কোনো গুরুত্ব নেই, জেন্ডারেরও নয়। এই নাটকে বরং আত্মআবিষ্কার ও ব্যক্তিসত্তাই (সেলফ) প্রধান। ফলে নাটকটি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয় নি, নোরার মধ্যেও নারীবাদ আবিষ্কার করতে যাওয়া ঠিক হবে না। এই মতের সপক্ষে তাদের যুক্তি হলো, প্রথমত, সত্যিকার শিল্প কখনও বিতর্কমূলক হতে পারে না, ফলে নারীবাদীও নয়। তাঁদের মতে মানবাধিকার সংগ্রামের কথা বাদ দিয়ে শুধু নারীর সমঅধিকারের কথা বললে, শারীরিক ও সামাজিক দিক থেকে নারীকে দেখলে, সেই দেখা সংকীর্ণ হয়ে যায়। নারীর অধিকারকে তাই পুরুষের অধিকারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিল্পের দোহাই দিয়ে বলা হলো নারীর সমঅধিকারের আন্দোলন ট্রাজেডি বা কবিতার বিষয় হতে পারে না। কেননা এই বিষয়টি সর্বজনীন নয়। নারীপ্রধান যেসব নাটক আছে — যেমন শেক্সপীয়রের ক্লিওপেট্রা, রেসিনের ফায়েদ্রা, স্ট্রিন্ডবার্গের জুলি, বার্নাড শ'র ক্যানডিডার পরিণতি যে কোনো পুরুষের হতে পারতো। ফলে কোনো চরিত্র নারী কিনা সেদিক থেকে নয়, শিল্পের বিচারে উত্তীর্ণ চরিত্র কিনা সেটাই মূল কথা। নোরা হেলমারও সেদিক থেকে বলতে গেলে শুধু নিজের কথাই ভেবেছেন, নিজের স্বার্থেই স্বামী-সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন। উনিশ শতকের ইউরোপীয় (বা নরওয়েজীয়) বিবাহিত নারী হিসেবে বা শুধু নারী হিসেবে নোরার দ্বন্দ্ব তাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। নোরার পরিণাম সম্পর্কে তাদের, অর্থাৎ দর্শকদের বিচলিত না হলেও চলে। কিন্তু এসব সমালোচনা, বলাবাহুল্য, একেবারেই একপেশে, একচক্ষুবিশিষ্ট। অন্তত ইবসেন যা মনে করেছেন এবং নাটকের কাহিনীর বিকাশ যেভাবে ঘটেছে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের যে মাত্রা এতে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে নাটকটি লেখাই হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ইবসেনই জানিয়ে গেছেন, সেই বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা, "আমি যদি সততার সঙ্গে বলি তাহলে বলতে হয় যে শেষ দৃশ্যের জন্যই আসলে পুরো নাটকটি লেখা হয়েছে।" এই দৃশ্যটিই, বলাবাহুল্য, নারীবাদী ভাবনা ও বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। লক্ষ করলে দেখা যাবে, তিনটি দিক থেকে *আ ডলস্ হাউজ* নারীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেখা হয়েছে।

প্রথমত, প্রথম দিকের নারীবাদীরা নারী-পুরুষের তুলনামূলক অবস্থার বিবরণ তুলে ধরছিলেন। কেউ কেউ নারীর করুণ অবস্থার জন্য পুরুষদের প্রতি অভিযোগের আঙুলও তুলছিলেন। নোরাকেও দেখা যায়, তাঁর করুণ অবস্থার জন্য তিনি তাঁর বাবা ও স্বামীকে অভিযুক্ত করছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, তাঁরা দুজনেই পাপ করেছেন, "আমার বাবা এবং তুমি আমার প্রতি ভয়ানক অন্যায় করেছ। তোমাদের পাপেই তোমাদের দোষেই আমার জীবনে কিছু হল না।" মেরি উলস্টোনক্রাফট্‌ও অভিযোগ করেছেন যে, নারীর জন্ম হয়েছে বুঝি শুধু পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য। নারীকে এজন্য হতে হয় "ভদ্র-নম্র, গৃহপালিত পশু"। নোরাও নিজেকে অনেকটা এরকমই ভেবেছেন — তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন এক পুতুল-স্ত্রী, যাঁকে ফন্দিফিকির করে বাঁচতে হয়। মার্গারেট ফুলারও এরকমই একটা উপমা ব্যবহার করেছেন নারীদের সম্বন্ধে, "পুরুষেরা কোনো নারী চায় না, চায় বালিকা, যাঁর সঙ্গে সে কেলি করতে পারবে।"

দ্বিতীয়ত, নারীবাদী বিবর্তনের দ্বিতীয় ধারায় উনিশ শতকে নারীর বৌদ্ধিক ও আত্মিক উন্নয়নের ওপরই জোর দিয়েছিলেন নারীবাদীরা। নোরাও ঠিক এমনটাই ভেবেছেন, কোনো কাজের যোগ্য নন তিনি। কারো স্ত্রী হবার, সন্তানের মা হবার। নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে আসলে নারীর মুক্তি নেই। আত্মোপলব্ধির মুহূর্তে নোরা হেলমারকে সেকথাই জানাচ্ছেন, "...আর একটি কাজ আছে যেটা আমাকে সবার আগে শেষ করতে হবে — নিজেকে শিক্ষিত করা।" হারিয়েট মার্তিনিউ বলেছেন, "নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে পুরুষের সহযাত্রী হবার জন্য, খেলা বা দাসী হবার জন্য নয়"[৮]

সবশেষে নোরা মনে করেন, "স্ত্রী ও মায়ের" চাইতেও তাঁর উচ্চতর আরও একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর "নিজের প্রতি দায়িত্ব"। নারীবাদী চিন্তার মূল কথা এটাই। নারী কোনো দিক থেকে — নৈতিক-বৌদ্ধিকভাবে পুরুষের তুলনায় ন্যূন নন। এসব ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করা শুধু তার অধিকার নয়, দায়িত্বও বটে। এর উন্নয়নেও তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। উলস্টোনক্রাফট তো সেকথাই জানিয়ে গেছেন : "নারীর চূড়ান্ত কাজটা হবে তার নিজের বিকাশ সাধনে যা কিছু দরকার তা-ই করা।"

আইন ও ভালোবাসার মধ্যে দ্বন্দ্ব, এটাই হচ্ছে এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ক্রোগস্টাডের সঙ্গে জালিয়াতি করে নোরা স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য যে চুক্তি করে, সেটাই তার অপরাধ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো স্ত্রীর কি অধিকার নেই স্বামীর জীবন বাঁচানোর ? নোরা সেই প্রশ্নটাই করেছেন এই নাটকে : "... স্বামীর জীবন রক্ষার অধিকার কি স্ত্রীর নেই ? আইন সম্বন্ধে আমি তেমন কিছু জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত

যে আইনে এই ব্যাপারটিকে কোথাও-না-কোথাও বৈধ করা হয়েছেই।" নোরার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হলো, তার প্রতি ডাক্তার র‍্যাঙ্কের দুর্বলতাকে নোরা প্রশ্রয় দিয়েছে, যা অনৈতিক। নোরা যেহেতু বিবাহিত এবং তাঁর স্বামী-সন্তান রয়েছে, সুতরাং কোনো পুরুষকে তাঁর প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। পারিবারিক যে কোনো মানদণ্ড অনুসারে এই অভিযোগও অযৌক্তিক। কেননা সংকটের মুহূর্তে নোরা যখন দিশেহারা, ডাক্তার র‍্যাঙ্ক তখন সাহায্যের উদার হাত বাড়িয়ে দিলেও নোরা সেই সাহায্য গ্রহণ করেন নি। অথচ ডাক্তার র‍্যাঙ্ক তাঁকে সাহায্যের জন্যে একরকম মুখিয়েই ছিলেন। তবে নাটকের অভ্যন্তর সংলাপ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে এই পুরুষই যে তাঁকে নারী হিসেবে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, নোরার তা বুঝতে বাকি থাকে নি। ডাক্তার র‍্যাঙ্কের মাধ্যমেই নোরা উপলব্ধি করে যে তাঁর স্বামী কতটা আলাদা ধরনের মানুষ।

নোরার চরিত্রকে তাই শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাটাই বড়ো কথা নয়। তাঁকে প্রথমে নারী, এরপর তাঁর মানবিক অবস্থান বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন সমালোচকেরা। কেননা নোরাকে যদি শুধু মানবিক হয়ে ওঠার দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে নারীর আবহমানকালের যে সংগ্রাম তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, তা গৌণ হয়ে যায়। নোরার চরিত্রকে যেসব সমালোচক অসম্পূর্ণ বলে মনে করেন তাঁদেরও কীভাবে তাঁর চরিত্রটি অবনির্মিত (deconstruction) হতে পারে জোনাথন কালারের ব্যাখ্যা অনুসরণে তা বিনির্মাণ করে দেখানো যায়।[৯] কিন্তু কোনো সমালোচকই এখন অবধি এই বিকল্প ব্যাখ্যা দেয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি। বরং গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, স্বামী টোরভাল্ড সব সময় এই নাটকে প্রাধান্যের জায়গায় থেকে কথা বলেছেন। স্ত্রী নোরাকে তিনি অধস্তন মনে করেছেন। নোরার চরিত্রকে যেসব সমালোচক স্বার্থপর আর নারীর মতো নয় বলে মনে করেছেন, তাঁরা আসলে টোরভাল্ডের চোখ দিয়েই নোরাকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের নোরা টোরভাল্ডেরই নোরা। এই সব সমালোচকের অধিকাংশই আবার পুরুষ। কিন্তু ইবসেন প্রকৃতপক্ষে কী চেয়েছিলেন ? নোরা চরিত্র নির্মাণের পেছনে কী ছিল তাঁর লক্ষ্য ? এই বিষয়টি, কোনো সন্দেহ নেই, গভীর অভিনিবেশ আর জেন্ডার-সংবেদনশীল মুক্তদৃষ্টি দিয়ে দেখা উচিত।

২

Her home —out there
On liberty's sea
Where the poet sets sail
Where his thoughts roam free.

Henrik Ibsen

ইবসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি *আ ডলস্ হাউজ*। এই নাটকের প্রধান চরিত্র নোরা হেলমার। ইবসেন গভীর মমত্ব আর অনুরাগ নিয়ে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। প্রশ্ন হলো, ইবসেনের কোন্ মন্তব্যটি যথার্থ ? নাটকটি কুড়ি বছর পর নরওয়েজিয়ান উইমেন রাইট্স লিগের ভোজসভায় 'মানবতা'ই এর মূল বিষয়বস্তু বলে উল্লেখ করেছিলেন সেই কথাগুলো, নাকি নাটকটি রচনার অব্যবহিত মুহূর্তে যা বলেছিলেন সেই কথাগুলো ? প্রকৃতপক্ষে নাটকটি রচনার মুহূর্তে যে-কথাগুলো তাঁর মনে এসেছিল সেই কথাগুলোকেই আমরা অনেক বেশি আন্তরিক আর অকৃত্রিম বলে ধরে নিতে পারি। ইবসেন তখন বলেছিলেন :

> A woman cannot be herself in contemporary society, it is an exclusively male society with laws drafted by men, and with counsel and judges who judge feminine conduct from the male point of view.[১০]

নোরার সংঘাত ও সংগ্রাম তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোনো নারী বা পুরুষের আত্মানুসন্ধানের কাহিনী নয়, নাট্যকার ইবসেনের মতে "প্রত্যেক পুরুষের সঙ্গে প্রত্যেক নারীর সংগ্রাম"ই এই নাটকের উপজীব্য বিষয়।[১১] ১৮৭৯ সালের বসন্তে নাটকটি লেখার পরিকল্পনা করার সময় ইবসেনের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে যা থেকে নারী আন্দোলনের প্রতি তাঁর যে সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল তা বোঝা যায়। ইবসেন তখন রোমে। রোমের স্ক্যান্ডেনেভীয় ক্লাবের নির্বাচনে নারীরা যাতে ভোট দানের সুযোগ পান সেজন্য প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়ে এর সদস্যদেরকে তাঁর প্রস্তাব সমর্থনের আহ্বান জানান। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন করেন :

> Is there anyone in this assembly who dares to claim that our women are inferior to us in culture, intelligence, Knowledge or artistic talent? I don't think many men would dare to suggest that. [১২]

ইবসেনের জীবনীকার মেয়ার জানাচ্ছেন ঠিক এর দু মাস পরেই ইবসেন *আ ডলস্ হাউজ* লেখা শুরু করেন।[১৩] সমকালের মানুষের কাছে এই নাটকটি ছিল সুস্পষ্টভাবে নারী প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা নাটক। ফলে ১৮৮০ দশকের পর থেকে এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে *আ ডলস্ হাউজের* অসংখ্য উচ্ছ্বসিত সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সমালোচকেরাও ছিলেন সেকালের সব বিখ্যাত ব্যক্তি — লুই আন্দ্রে-সালোমে, আল্লা নাজিমোভা, জর্জ ব্রান্ড, অগুস্ত স্ট্রিন্ডবার্গ প্রমুখ। তাঁরা সবাই এবং পত্রপত্রিকাতেও তখন লেখা হচ্ছিল যে এই নাটকের মূল বিষয় হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক নারীর অধস্তনতা। এরই প্রতিক্রিয়ায় নরওয়েতে নারী-পুরুষের নতুন সামাজিক বিন্যাস আসন্ন হয়ে ওঠে। নাটকটি প্রকাশের পাঁচ বছর পর ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নরওয়েজিয়ান উইমেন্স রাইট্স লিগ। ইবসেন ওই সংগঠনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৯০ সালে (অর্থাৎ নাটকটি প্রকাশের ১১ বছর পর) বেটি হেনিংস লেখেন, "শিক্ষার অধিকার, কাজের স্বাধীনতা আর রাজনৈতিক ভোটাধিকার শুধু নয়, সভ্য সমাজে একজন সাধারণ বয়স্ক মানবপ্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার" নারীর যে থাকা দরকার, ইবসেনের নোরা তা দেখিয়ে দিয়েছেন।[১৪] ইবসেন এরকমও মত প্রকাশ করেন যে প্রগতিশীল দল গঠন করে আন্দোলন করা না হলে ইউরোপে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন সফল হবে না। ফলে ইবসেন শুধু নারী অধিকার সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন না, তিনি সেই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্তও ছিলেন। তবে সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে তিনি নিজের মতো করে সমাধানের কথা লিখেছিলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলন করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। ইবসেনের জীবনীকারদের মতে তিনি শিল্পী হিসেবে ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ এবং জন্মগতভাবে তার্কিক। তবে তিনি শুধু মহৎ ভাবের দ্বারা জীবনকে চালিত করতে চান নি, আবার সমকাল সম্পর্কেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। নারীবাদের প্রতি তাঁর যে অকুণ্ঠ অকৃত্রিম সমর্থন ছিল, সমকালীন নরওয়েজীয় ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও নারীবাদী লেখক ক্যামিলা কোলেতকে লেখা চিঠি থেকেও তা বোঝা যায়।[১৫]

প্রকৃতপক্ষে নোরার ভাবনা ইবসেনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিল। তাঁর প্রথম দিকের বিভিন্ন রচনায় নারীবাদী ভাবনাও অনেকটা জুড়ে ছিল। এই ভাবনার সূত্রপাত ঘটে *লেডি ইঙ্গার অব ওস্ত্রাত* রচনার মাধ্যমে। এই রচনায় মানবিক সম্পর্ক যে জেন্ডার পার্থক্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার উল্লেখ রয়েছে। এরপর *দ্য ভাইকিংস অ্যাট হেলগিল্যান্ড*, *লাভস কমেডি*, *দ্য প্রিটেনডারস*, *ব্র্যান্ড*, *এমপেরর অ্যান্ড গ্যালিলিয়েন*, *দ্য পিলারস অব সোসাইটি* শীর্ষক বিভিন্ন রচনাতেও নারী-পুরুষের সম্পর্ককে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকের ইতিহাসের দিক থেকে *পিলারস অব দ্য সোসাইটি* উনিশ শতকের একটা গুরুত্বপূর্ণ নাটক। আধুনিক জীবনের গদ্যনাট্যরূপ আর নাটকীয় বাস্তববাদের জন্য এই নাটকটি উল্লেখযোগ্য। এই

নাটক রচনার জন্য ইবসেন ক্যামিলা কোলেতের সঙ্গে সমকালীন নারীবাদ সম্পর্কে কথা বলতেন। কোলেতও চাইতেন ইবসেন নারীবাদ নিয়ে নাটক লিখুন। নরওয়ের নারীবাদী নেত্রী ও বিদ্রোহী নারী আস্তা হানস্তিনের প্রত্যেক্ষ প্রভাবে ইবসেন নির্মাণ করেন *পিলারস অব সোসাইটি* নাটকের লোনা হেসেল চরিত্রকে। এই নাটকে এরকম আরও একটি নারীচরিত্র আছে — ডিনা। লোনা ও ডিনা নতুন কালের নতুন দুই নারী, যারা আধুনিক কালের নারীর মতো স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দেন, নিজেরাই অর্থ উপার্জন করে জীবন নির্বাহ করেন, প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, যাপন করেন একক জীবন। ডিনাতো তাঁর হবু স্বামীকে বিয়ের আগেই স্পষ্ট করে জানায়, "প্রথমে আমি কাজ করতে চাই। তোমার মতো একটা কিছু হতে চাই। আমি এমন কিছু হতে চাই না যাকে অগ্রাহ্য করা যায়।" *পিলার অব সোসাইটি* নাটকটি খুবই স্বল্পপরিচিত নাটক। কিন্তু এটিই মূলত উনিশ শতকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নারীবাদী নাটক। এই নাটকের দুটি সংলাপের একটিতে বার্ণিক নামের এক পুরুষ বলছেন, "তোমরা, মানে নারীরাই সমাজের স্তম্ভ।" কিন্তু এক নারী প্রত্যুত্তরে বলে, "না প্রিয়, সত্য আর স্বাধীনতাই সমাজের স্তম্ভ।"

একজন গবেষক দেখিয়েছেন, নোরা কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়। ইবসেনের জীবনেই কন্যাতুল্য এরকম এক নারীর আবির্ভাব ঘটে যার নাম ছিল লরা পিটারসন কেইলার (১৮৪৯-১৯৩২)। ইবসেন পরিবারের সঙ্গে তার দারুণ সখ্যতা গড়ে ওঠে। উনিশ বছর বয়সে লরা *ব্র্যান্ডের কন্যারা* (ব্র্যান্ড নামে ইবসেনও একটি নাটক লেখেন) নামে একটি নাটক লিখে ইবসেনের কাছে পাঠিয়ে দেন প্রকাশের জন্য। লরা বিয়ে করেছিলেন ভিক্টর কেইলার নামের এক ডেনিশ নাগরিককে। কেইলার যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে টাকা ধার করে তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য লরা ইতালি যান। সুস্থ হওয়ার পর স্বামী যখন জানতে পারে লরা সেই ধার শোধ করার জন্য জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে, তখন সে এই বলে লরার বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের মামলা করে যে লরা তার সন্তান পালনের উপযুক্ত মা নন। ভিক্টর এরপর আদালতের নির্দেশে তাদের দুই সন্তানকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেন আর স্ত্রীকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেন। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভিক্টর স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়। লরা আবার দাম্পত্য জীবন শুরু করে। লরার এই কাহিনী ইবসেনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেল। এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি লেখেন *আ ডলস্ হাউজ* নাটকটি। লক্ষণীয়, লরার কাহিনীই হচ্ছে *আ ডলস্ হাউজ* এর কাহিনী। তবে বাস্তবের এই কাহিনীকে শিল্পের প্রয়োজনে আর নিজের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে ইবসেন অনেকটাই বদলে ফেলেন। লরা ছিলেন লেখক, নোরা গৃহবধূ। লরা লিখে ধার শোধ করতে চেয়েছেন, নোরা কপি করে স্বামীকে সাহায্য করেছেন। তবে লরার স্বামী

তাকে মাতৃত্বের জন্য যে অনুপযুক্ত বলেছিলেন, ইবসেন সেই সূত্রটিকে নাটকে ঠিকই ব্যবহার করেছেন আর বদলে দিয়েছেন লরার পরিণামকে। লরা স্বামীর কাছে ফিরে আসেন কিন্তু নোরা স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যান। ইবসেন ঠিকই বলেছিলেন যে এই শেষ দৃশ্যটির জন্যই নাটকটি লিখেছেন তিনি। এভাবেই এক মহান শিল্পী রচনা করেন চিরায়ত এক নাটক, *আ ডলস্ হাউজ*। লরা যখন সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিলেন ইবসেন সেই সময় একটা নোটে লেখেন :

> She has committed a crime, and she is proud of it; because she did it for love for her husband and to save his life. But the husband, with his conventional view of honor, stands on the side of the law and looks at the affair with male eyes.[১৬]

উল্লিখিত নোটে ইবসেন যে মন্তব্য করেন, পরবর্তীকালে *আ ডলস হাউজে* দেখা গেল সেই ভাবনারই প্রতিফলন। ইবসেন যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বা জেন্ডার কিংবা নারীবাদ নিয়ে কত গভীরভাবে ভেবেছিলেন, এই নোটের মন্তব্যগুলো লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়।

৩

A breaker of the law? Perhaps —
Yet something shines above all laws,
Even as the crown of mist
Above the mountain-top.

Henrik Ibsen

নারী ও পুরুষ — দুই পৃথিবী তাদের। সভ্যতার শুরু থেকেই বিভাজন চলে আসছে। বিভাজনের সূত্রপাত করে পুরুষ। এরই প্রভাবে পুরুষতন্ত্র পৃথিবী জুড়ে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। পুরুষ ভেবেছে সে-ই শ্রেষ্ঠ, নারী থাকবে তার অধস্তন হয়ে। সমস্ত কর্তৃত্ব তারই। পুরুষতন্ত্রেরই একটা প্রতীক হচ্ছে ঘর। পুরুষ মনে করে এটাই নারীর পৃথিবী। এই ঘরে পুতুলই মানায়। নারী হচ্ছে সেই পুতুল। পুরুষ একথাই ভেবেছে আর নারীর সঙ্গে সেভাবেই আচরণ করেছে। এই আচরণের মধ্যে আছে তীব্র অহংবোধ, বীরত্বের ভাব (*Chivalry*)। এ থেকেই পৌরুষের সৃষ্টি। *আ ডলস্ হাউজের* শুরু থেকেই এই পৌরুষ আর বীরত্বের ভাব দেখিয়ে চলে নোরার স্বামী টোরভাল্ড হেলমার আর পুতুল

পুতুল আচরণ করে নোরা। নারী আর পুরুষের এই দুই পৃথিবীর কথা অন্য কোনো নাটকে এতটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি যতটা এই নাটকে। নোরাকে কেন্দ্র করেই পুরুষতান্ত্রিক এই পৃথিবী যে কত করুণ আর অমানবিক হয়ে উঠতে পারে, পাঠকের চোখে সহজেই তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। নারী-পুরুষের এই বিভাজিত পৃথিবী, সাম্প্রতিককালে নারীবাদীরা বলছেন যে, এ হচ্ছে একধরনের মতাদর্শিক নির্মাণ। এই মতাদর্শের কারণেই নারী আর পুরুষের সম্পর্ক অসম হয়ে গেছে। কেবল নারী হয়ে জন্মাবার কারণে তার পৃথিবী আলাদা করে ফেলা হয়েছে।[১৭] বিশ্বসাহিত্যে দ্বিতীয় এমন কোনো নাটক নেই যেখানে এরকমভাবে স্বামীর ভণ্ডামি, কূপমণ্ডুকতা, অহংবোধ, স্বামীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া, কাজের জগত থেকে নারীকে বাইরে রাখা কিংবা নারী কেন অধস্তন হয়ে পড়ে এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ইবসেনের স্বামী-স্ত্রী — পুতুলের সংসারের দম্পতি মূলত স্ক্যান্ডেনেভীয় বিয়ের বুর্জোয়া ধারণাকেই প্রতিফলিত করে। এই ধারণা অনুসারে স্বামী শ্রেষ্ঠ আর যে-কোনো বিচারে স্ত্রীর স্থান তার নিচে। এই ধারণা অনুসারে স্ত্রী হবে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বামীর প্রতি অনুগত। নোরার প্রতি টোরভাল্ডের আচরণ আর উচ্চারণ থেকে বোঝা যায় যে, সে নিজেকে নোরার অভিভাবক, পরামর্শক হিসেবে বিবেচনা করেন। এমনকি টারান্টালা নাচটাও কীভাবে নাচতে হবে সে ব্যাপারেও সে খবরদারি করেন। প্রথম থেকেই সে নোরাকে এমন ভাষায় সম্বোধন করেন যা থেকে তাঁর কাছে নোরার অবস্থান কী তা বোঝা যায় । প্রথম দৃশ্যের কথাই বিবেচনা করা যাক। এই দৃশ্যে নোরাকে টোরভাল্ড তিনবার লার্ক গানের পাখি, তিনবার কাঠবেড়ালি, একবার শূন্যমস্তিষ্ক নারী এবং তিনবার অমিতব্যয়ী পাখি বলে সম্বোধন করেছেন। প্রথম দৃশ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী যে পুরুষের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সে কথা বুঝিয়ে দেন ইবসেন। নোরাও স্বামীর কথা মেনে নেন। কিন্তু টোরভাল্ড একথা শোনাতে ভোলেন না যে, "এটা হল একটি ছোট্ট মিষ্টি পাখি। তবে এ পাখি পুষতে খরচ অনেক।" এভাবেই সামান্য খুনসুটির মধ্য দিয়ে স্বামী টোরভাল্ড তাঁর ওপর যে নোরা নির্ভরশীল সে কথা বলে চলেন। নোরাও জানান, "তুমি যা পছন্দ কর না আমি কখনো তা করি না।" এই দৃশ্যেই দেখা যায়, টোরভাল্ড নোরাকে একটু-আধটু আদর করেন ঠিকই কিন্তু ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। নোরা আটকে যান গৃহের বৃত্তে, পুতুলের সংসারে। নোরাকে তাই বলা যায় সামান্য এক পোষা বউ (Pet wife), স্বামী টোরভাল্ড তার দয়ালু রক্ষক। একসময় সংসারের প্রয়োজনে নোরাও কাজ করেছে, তবে সেই কাজ ছিল সূচির কাজ, 'কুরুশ-কাঁটার কাজ, এমব্রয়ডারি'। শুরু থেকেই তাঁর চরিত্রের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, সাহস, আত্মগৌরবের অভাব দেখা যায়। একবার সে টোরভাল্ডের কাছে ভিক্ষে করার মতো করে টাকাও চেয়ে বসেন। সংকীর্ণ এই 'নারীর পৃথিবী' আর সেই

পৃথিবীতে ফিরে স্বামীরা কী রকম আচরণ করেন, সে সম্পর্কে ইবসেনের ধারণা যে কতটা স্পষ্ট আর গভীর ছিল, নাটকটি রচনার কুড়ি বছর পর শার্লট পারকিন্স গিলম্যানের একটি লেখাতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় :

> The man, spreading and growing with the world's great growth, comes home, and settles into the tiny talk and fret, or the alluring animal comfort of the place, with a distinct sense of coming down. It is pleasant, it is gratifying to every sense, it is kept warm and soft and pretty to suit the needs of the feebler and smaller creature who is forced to stay in it.[১৮]

সামাজিক-পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, নোরা একজন প্রান্তিক নারী। শুধুমাত্র নারী হবার কারণেই তিনি প্রান্তিকতার শিকার। অর্থ উপার্জন আর ব্যয় — এই একটি দিক থেকেই ইবসেন বুঝিয়ে দিয়েছেন যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী কতটা প্রান্তিক হয়ে পড়েন। উপার্জন তো দূরের কথা নারী হিসেবে নোরা স্বামীর অনুমতি ছাড়া টাকা ধারও করতে পারেন না। তাকে অবৈধ পথের আশ্রয় নিতে হয়। অর্থনৈতিক কারণেই নারীর অবস্থা অধস্তন হয়ে পড়ে। অবৈধ পথে যদিওবা নোরা টাকা ধার করেছেন, পরিশোধ করা হয়ে পড়েছে আরও দুরূহ। কিন্তু নোরা যে টাকা ধার করেন, কিংবা খরচ করেন, তার কোনো কিছুই নিজের জন্য নয়, স্বামী আর সন্তানদের জন্য। লিন্ডেকে সে বলে : "হ্যাঁ, এটা গর্বেরই বটে, তুমি তোমার মার জন্য করেছ, তোমার ভাইদের জন্য করেছ। আমি করেছি আমার স্বামীর জন্য। আমি টোরভাল্ডের জীবন রক্ষা করেছি। আমি তাকে বাঁচিয়েছি।" স্বামীর টাকা সে "কখনো অর্ধেকের বেশি খরচ" করেন নি, "সব সময় শাদাসিধে কমদামি জিনিস" কিনেছেন। স্বামী আর সন্তানদের সুখে রাখার জন্য কাজ খুঁজে পাওয়া, রাত জেগে কপি করে টাকা উপার্জন করার মধ্যে নোরা আনন্দ খুঁজে পান, গর্ববোধ করেন। এ প্রসঙ্গে লিন্ডেকে সে জানান : "আমি আরো উপার্জনের পথ খুঁজে বের করলাম। গত শীতে সৌভাগ্যক্রমে অনেকগুলো কপি করার কাজ জুটে গেল — একেবারে দরজা বন্ধ করে লিখতে লেগে গেলাম। কখনো কখনো মাঝরাত পার হয়ে যেত। ওহ্ — দু-এক সময় এত ক্লান্ত লাগত যে সে কথা আর কী বলব। তবুও ব্যাপারটা আমার কাছে দারুণ মজার ছিল — বসে বসে কাজ করা আর টাকা উপার্জন করা। প্রায় পুরুষ মানুষের মতো কাজ করেছি তখন।"

ইবসেন নোরার মাধ্যমে পুরুষতন্ত্রের গতিপথ এভাবেই ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাকে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে গড়ে তুলে নারী-পুরুষের পার্থক্যের যে বোধ সমকালীন সমাজে বিরাজ করছিল, পার্থক্যের সেই বোধে আঘাত করেছেন। যে কাজ মূলত পুরুষের সেই বড়ো কাজটিই নোরা করেছেন — স্বামীর জীবন রক্ষা করেছেন। অথচ এই স্বামীই সেরে ওঠার পর, আমরা দেখতে পাই, পুরুষের সনাতন ভূমিকায় ফিরে গেছেন। হয়ে উঠেছে নোরার রক্ষক, অর্থের যোগানদাতা, আচার-আচরণের (যেমন টাকা ব্যয় করা, নাচের খবরদারি করা) সতর্ক পর্যবেক্ষক। এখানেই শেষ নয়, নোরা যখন জানান টোরভাল্ডের জীবন বাঁচানোর জন্যই তিনি ক্রোগস্টাডের কাছ থেকে বাবার সই জাল করে টাকা ধার করেছেন, তখনই টোরভাল্ডের পুরুষতান্ত্রিক চেহারা দর্শকদের কাছে একেবারে নগ্ন হয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে নায়ক থেকে খলনায়কে পরিণত হন। নোরাকে তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আক্রমণ করে বসেন। তবে এই নাটকের বাঁক মুহূর্তটি আসে এর কিছু পরেই। ক্রোগস্টাড যখন নোরাকে তাঁর জালিয়াতি থেকে মুক্তি দিয়ে চিঠির বাক্সে চিরকুট ফেলে যান, তখন টোরভাল্ডের নারীরক্ষকের বীরত্বের (*Chivalry*) মুখোশ একেবারে খসে পড়ে। তার অন্তঃসারশূন্য, স্বার্থপর, কপট রূপ দেখে ফেলার পরই নোরার সকল মোহভঙ্গ ঘটে যায়। নোরা অর্থ জালিয়াতি করেছিল স্বামীকে বাঁচানোর জন্য, সে ভেবেছিলেন ক্রোগস্টাডের সঙ্গে দ্বন্দ্বে টোরভাল্ড তার পাশে দাঁড়াবেন, মুখোমুখি হবে সত্যের। কিন্তু এর পরিবর্তে নোরা দেখলো তার নীতিজ্ঞানশূন্য আত্মকেন্দ্রিক রূপ। হেলমারকে চেনার সেই মুহূর্তটি এরকম :

> হেলমার : (বাতির কাছে গিয়ে) ওহ্-সাহস- হচ্ছে না- এ ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে হয়ত আমাদের সর্বনাশ লেখা আছে । নাহ্! আমাকে জানতেই হবে! (চিঠিটা ছিঁড়ে — কয়েক লাইনের উপর গড়গড় করে চোখ বুলায়। উল্টিয়ে সংযুক্ত একটি কাগজ দেখে — তারপর আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।) নোরা! (নোরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।) নোরা দাঁড়াও আমি আবার পড়ছি-হ্যা, সত্যই। ওহ্ বেঁচে গেলাম। নোরা আমি বেঁচে গেছি, ওহ্ আমি বেঁচে গেছি।
>
> নোরা : আর আমি?

টোরভাল্ডের উল্লিখিত সংলাপটি লক্ষণীয়। সর্বনাশের ক্ষেত্রে টোরভাল্ড উভয়ের ('আমাদের') সর্বনাশের কথা ভাবলেও রক্ষা পাওয়ার সময় 'আমি' সর্বনামটি দু বার ব্যবহার করেছে। এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নোরার কাছে টোরভাল্ডের নীতিশূন্য আত্মকেন্দ্রিক রূপটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই প্রায় আর্তনাদের মতো নোরা উচ্চারণ করে, "আর আমি ?" অর্থাৎ এতদিন ধরে স্বামীর যে আদর্শায়িত রূপটি সে নিজের

মধ্যে লালন করে আসছিলেন, মুহূর্তের মধ্যে তা ধূলিস্মাৎ হয়ে যাওয়ায় নোরা মানসিকভাবে নিক্ষিপ্ত হন অপার শূন্যতার গহ্বরে। অথচ একটু আগেই টোরভাল্ড নোরাকে একজন নীতিবাগীশের মতো কত বড়ো বড়ো কথাই না বলছিলেন :

> তুমি আমার সব সুখ নষ্ট করেছ, শান্তি বিনাশ করেছ — সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছ আমার গোটা ভবিষ্যৎ। ওহ — এটা চিন্তাই করা যায় না! আমি নীতজ্ঞানশূন্য একটা অবিবেচকের হাতের মুঠোয়। সে এখন আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করাতে পারে। তাকে জিজ্ঞাসা কর সে আমার কাছে কী চায় — তার ইচ্ছামতো আমাকে নির্দেশ দিতে বল — এখন তো আমার আর 'না' করার শক্তি নেই। তোমার মতো একজন অবিবেচক অপদার্থ মহিলার জন্য দেখ, কী করুণ অধঃপতন আমার!

নিজের আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত পেয়ে পুরুষের অহংবোধ ওই মুহূর্তে অবদমিত থাকলেও ক্রোগস্টাডের কাছ থেকে বন্ডটা ফেরত পাবার পরপরই আবার সেই বোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বীররক্ষকের ভূমিকায় (chivalrous protector) আবার অবতীর্ণ হন। এবার তাঁর সংলাপের মধ্যে পাখি-প্রতিমার চমৎকার ব্যবহার করেছেন ইবসেন :

> ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তুমি নিশ্চিন্তে আরাম কর আর আমি আমার পাখা দুটি দিয়ে তোমাকে আড়াল করব। ... ক্ষিপ্র বাজের তীক্ষ্ণ নখের কবল থেকে পালিয়ে আসা পাখির মতো তোমাকে আমি অভয়ারণ্য দেব।

কিন্তু একটু আগেই যে নোরা ছিলেন হেলমারের নাচের সঙ্গী, পুতুল, তিনি ইতিমধ্যে তাঁর নাচের পোশাক বদলে ফেলেছেন। পুতুল থেকে নোরা এভাবেই একজন আত্মসচেতন দৃঢ়চেতা নারীতে রূপান্তরিত হলেন। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, নোরার চরিত্রটি যেহেতু একজন একক নারীর আত্মসচেতন হয়ে ওঠার কাহিনী, ফলে তার চরিত্রটি কোনো নারীবাদী চরিত্র নয়। কিন্তু এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, সিমোঁ দ্য বোভেয়ারের নারীর ক্ষেত্রে "যা কিছু ব্যক্তিগত, তাই রাজনৈতিক" কথাটি স্মরণ করলেই বোঝা যায়। টোরভাল্ডের অন্তঃসারশূন্য, কপট রূপটিই নোরাকে তাঁর বিবাহিত জীবনের অর্থ-অনর্থ, সন্তানদের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে কী, সেই বোঝাপড়া বা নোরার ভাষায় "দেনাপাওনা-হিসেবনিকেশের" জায়গায় নিয়ে আসে। নোরার তখনি মনে হয়, আট বছর তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা কখনও কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন নি। নোরার বাবা ও স্বামী দু-জনই তাকে "ভুল বুঝেছেন"। এমনকি জগত-জীবন সম্পর্কে নোরার নিজস্ব ধারণার কোনো গুরুত্ব ছিল না। নোরা এ প্রসঙ্গে এখন জানাচ্ছেন, "... বাবার

ধারণাটাই আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল। কখনো যদি আলাদা করে ভেবেছি — সেটা তাকে বলতে পারি নি, বরং লুকিয়েছি। কারণ জানতাম সেটা সে পছন্দ করবে না। সে আমাকে তার ছোট্ট পুতুল বলে ডাকত — আমি যেমন আমার পুতুলের সঙ্গে খেলা করতাম আমার বাবা তেমনই আমার সঙ্গে খেলা করত। তারপর আমি তোমার ঘরে বসবাস করতে এলাম ... আমি আমার বাবার হাত থেকে তোমার হাতে পাচার হলাম, তুমি সবকিছু তোমার পছন্দমতো সাজালে — তোমার পছন্দই আমার পছন্দ হয়ে গেল।" লক্ষণীয় 'ধারণা' শব্দটি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পুরুষ যে জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে নারীকে অধস্তন করে রাখে, নোরা কথার মধ্যে তারই উল্লেখ রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বলেও কিছু থাকে না। তার নিজস্ব ঘর বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্বীকার করে না। অনেকটা পণ্যের মতো নারী পিতার ঘর থেকে স্বামীর ঘরে "পাচার" হয় মাত্র। তিনি নিজে যেমন পুতুল, তেমনি তার ঘরও হয়ে দাঁড়ায় পুতুলের ঘর, খেলাঘর মাত্র। টোরভাল্ডকে উদ্দেশ্য করে এ প্রসঙ্গে নোরার উচ্চারণ : "যাকে তুমি সংসার বলো সে কেবল খেলাঘরই ছিল। আমি এখানে ছিলাম তোমার পুতুল-বৌ — যেমন বাবার বাড়িতে ছিলাম পুতুল-মেয়ে।" লক্ষণীয়, নোরা বা নারী কখনই বিষয় (subject) হয়ে উঠতে পারে নি, হয়ে উঠেছে সামগ্রী (object) আর যৌনসম্পত্তিবিশেষ।

নোরার এই কথাগুলোকে মেনে নিয়েছে টোরভাল্ড, কিন্তু এরপরও তিনি তাঁর প্রাধান্যের জায়গা থেকে সরে আসেন নি, নোরাকে 'শিক্ষা' দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এতদিনে নারী জেনে গেছে, "সত্যিকারের বউ হওয়ার শিক্ষা দেয়ার মতো যোগ্যতা" পুরুষের নেই। এখন নারীই নারীশিক্ষার ভার বা নিজেকে আলোকিত করার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাইছে। নোরা টোলভাল্ডকে একথাই জানিয়ে দেন, "... একটি কাজ আছে যেটা আমাকে সবার আগে শেষ করতে হবে — নিজেকে শিক্ষিত করা।" নোরার এই উচ্চারণ, বলাবাহুল্য, অদৃশ্য কোনো নরওয়েজীয় গৃহবধূর কথা নয়। এর রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে, সেই রাজনীতি হলো পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর ক্ষমতায়ন আর আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজনীতি। নিজের প্রতি নারীর দায়বোধ এখন অনেক স্পষ্ট। এই দায়বোধ থেকেই মানবিকতায় উত্তীর্ণ হয় নারী :

নোরা : টোরভাল্ড, আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই।

হেলমার : সেজন্য তোমার বাড়ি ছাড়তে হবে —স্বামী-সন্তান ছাড়তে হবে — মানুষ কী বলবে তুমি ভেবে দেখবে না ?

নোরা : সেটা ভাবা আমার কাজ নয়। এটা আমার প্রয়োজন — এটুকুই

আমি জানি।

হেলমার : কিন্তু এটা অপমানকর, লজ্জাজনক! তুমি কি এভাবেই তোমার পবিত্র দায়িত্বকে অবজ্ঞা করবে — প্রত্যাখ্যান করবে ?

নোরা : কোনটাকে আমার পবিত্র দায়িত্ব বলছ ?

হেলমার : সেটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে ? তোমার স্বামী-সন্তানের প্রতি কি তোমার কর্তব্য নেই ?

নোরা : এরকম পবিত্র দায়িত্ব আমার আরো একটি আছে।

হেলমার : কোন দায়িত্বের কথা বলছ ?

নোরা : আমার নিজের প্রতি দায়িত্ব।

হেলমার : সবকিছুর আগে তুমি স্ত্রী এবং মা।

নোরা : সেটা আমি এখন আর বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি সবকিছুর আগে আমি একজন মানুষ — যতটুকু তুমি, ততটুকু আমি।

ইবসেনের *আ ডলস্ হাউজ* নাটকের সর্বজনীনতা মূলত এখানেই। না, শুধু মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের দিক থেকে এই নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রশ্নে সমানাধিকার ও সমতার দাবি জোরালোভাবে উচ্চারিত হওয়ার। নিজেকে চেনার ও বদলে ফেলার আত্মপ্রত্যয়ী ঘোষণা আর আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করায়। এজন্যই নোরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে পেরেছেন, 'ধর্ম' কী তা তিনি দেখতে চান। 'আইন'ই যে সঠিক তাও তাঁর যথার্থ মনে হয় না। শুধু তাই নয়, এই পৃথিবীটাই নারীর অনুকূল নয়। যে পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সম্পর্কই অসম হয়ে আছে, সেই পৃথিবীকেই নারী এখন ঠিক ঠিক চিনতে চায়। হেলমার তাই যখন বলেন, "যে জগতে বাস কর সে জগৎই তুমি চেনো না," উত্তরে নোরা জানান, "সত্যি। আমি চিনি না। আমি এখন সেটাই চেনার চেষ্টা করব। পৃথিবী সঠিক না আমি সঠিক সেটা খুঁজে বের করতে হবে।"

নারীবাদী সমালোচক সান্ড্রা গিলবার্ট এবং সুসান গুবার বলেছেন, উনিশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে নারীর "নাটকীয়ভাবে গৃহ বন্দী হওয়ার ছবি পাওয়া যায়, তেমনি সেই গৃহ থেকে তাঁর পালানোর ছবিও আছে।"[১৯] সেকালের সাহিত্যের এটাই ছিল অভিনব বৈশিষ্ট্য। নারী লেখকেরা এভাবেই তখন নারীর জীবনচিত্র এঁকেছেন। এই প্রেক্ষাপটে দেখলে *আ ডলস্ হাউজ* নাটকে সমকালের পুরুষের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা এই নাটকের নায়িকা নোরা ঘর ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু লক্ষণীয়,

সেকালের কোনো পুরুষই নোরার এই গৃহত্যাগকে মেনে নিতে পারেন নি। কেবল কোনো পুরুষের পক্ষেই এভাবে গৃহত্যাগ করা সম্ভব, মনে হয়েছে তাঁদের। অন্যদিকে সন্তানের কারণে নোরার সংসার ত্যাগ করে যাওয়া ঠিক হয় নি বলে মনে করেছেন যে সব পুরুষ তাঁদেরই অধিকাংশই তারাও ইবসেনের শৈল্পিক সংবেদনাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। টোরভাল্ড সবসময় মনে করেছেন 'স্বামী ও সন্তানদের' প্রতি নোরার কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধ নারীর সনাতন দায়িত্ব। কিন্তু ইবসেন নারীর এই সনাতন ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একারণেই 'মা নোরার সঙ্গে স্ত্রী নোরা'র কোনো পার্থক্য করেন নি, নারীর সত্তাকে একক অভিন্ন সত্তা হিসেবেই দেখেছেন। একারণেই তাঁর লক্ষ্য ছিল নারীর একক সমগ্র সত্তায় পুরুষতন্ত্র কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, নতুন কালের নারী তার বিরুদ্ধে কী প্রতিক্রিয়া দেখায়, সেসব পর্যবেক্ষণ করা ও নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা। অর্থাৎ নারীসত্তা আর নারীঅধস্তনতার সমগ্র রূপ পর্যবেক্ষণ করাই ছিল ইবসেনের শিল্পীসত্তার মূল মনোযোগের বিষয়। সনাতন প্রচলিত ধারণা অনুসারে গৃহবধূর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতৃত্ব, যা সন্তান ধারণ আর লালন-পালনের মাধ্যমে পরিণতি খুঁজে পায়। কিন্তু নোরা আত্মোপলব্ধির মুহূর্তে নারীর এই (সন্তান) উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা আর সেবা দানের ভূমিকা অস্বীকার করেছেন। অ্যাড্রিয়ান রিখ এবং এলিজাবেথ ব্যাডিন্টার নারীর এই ভূমিকা নারীকে যে কীভাবে পুরুষের অধস্তন করে রাখে তার বর্ণনা দিয়েছেন যথাক্রমে *অব উইমেন বোর্ন*[১০] আর *মাদার লাভ : মীথ অ্যান্ড রিয়্যালিটি*[১১] গ্রন্থে। কিন্তু এই দু'টি গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় একশো বছর আগে ইবসেন নোরার মধ্য দিয়েই মাতৃত্বের মীথকে একেবারে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। নারীর আত্মবোধের সঙ্গে সন্তান লালন-পালনকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। নারীর আত্মমুক্তির সঙ্গে সন্তানের যে কোন সম্পর্ক নেই, ইবসেনের আগে সেকথা কেউ সাহিত্যে উল্লেখ করেন নি। *অ্যা ডলস্ হাউজ* নাটকে তাই দেখা যায় নোরা নিজেই টোরভাল্ডকে জানাচ্ছেন যে, 'বাচ্চাদের ব্যাপারে' তিনি আর যোগ্য নন। ইবসেনের নারীকে, বলাবাহুল্য, সংসারের কাজ আর সন্তান লালন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা সম্ভব নয়। নারী এখন বাইরের পৃথিবীতে পা দিয়েই মুক্তি খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু এই পৃথিবী, কোন সন্দেহ নেই যে, নতুন আত্মবোধে জাগ্রত নারীর জন্য একেবারেই সহজ হবে না। তবু এই পথেই নোরা পা বাড়ান। নোরার এই গৃহত্যাগের মধ্যেই মূলত তাঁর আত্মজাগরণ আর আত্মশক্তির বীজ লুকিয়ে আছে। পুতুল-পৃথিবী থেকে এভাবেই মুক্ত পৃথিবীতে গিয়ে নোরা অর্জন করে তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বৌদ্ধিক আত্মমুক্তি। নোরার এই ব্যক্তিক মুক্তির বোধ, বলাবাহুল্য যে, পরবর্তীকালে দেশে দেশে নারীবাদীদের কণ্ঠে ও রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে নোরার চরিত্রকে অনন্য হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। এই অনন্যতা, বলা যায়, যে

ঘটেছে নারীবাদীদের সূত্রেই। ইবসেন তাঁর সমস্ত রচনাকেই প্রতীকী অর্থে কবিতা বলে উল্লেখ করতে ভালোবাসতেন। সেদিক থেকে বললে তাঁর সৃষ্টি নোরাও একটি অনন্য কবিতা, আরও স্পষ্ট করে বললে, একটি নারীবাদী প্রতীকী কবিতা। বিশ্বসাহিত্যে নারীবাদী ভাবুক হিসেবে ইবসেনের অবদান তাই উল্লেখযোগ্য।

তথ্যপঞ্জি :

১. বাংলাদেশে এই নাটকের বাংলায় অনূদিত দুটি সংস্করণ পাওয়া যায় : *পুতুলের সংসার*, অনু. আবদুল হক, ঢাকা, ১৯৬৬ ; *নোরা*, অনু. খায়রুল আলম সবুজ, ঢাকা, ২০০০। এই প্রবন্ধে খায়রুল আলম সবুজের *নোরা*-র বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য তথ্যসূত্র দেখুন।

২. Code, Lorraine, ed., *Encyclopedia of Feminist Theories*, London, 2000, pp. 309-311

৩. Rogers, Katharine M, "A Doll House in a Course on Women in Literature," in *Approaches to Teaching Ibsen's A Doll House*, ed., Yvonne Shafer, New York, 1985, p. 81

৪. Ibsen, Henrik, *Letters and Speeches*, ed. and trans., Evrt Sprinchorn, New York, 1964, p. 337

৫. Adams, R.M., 'The Fifty-First Anniversary,' *Hudson Review* 10, 1957

৬. *Haungen, Einer, Ibsen's Drama : Author to Audience*, Minneapolis, 1979, p. vii

৭. Shafer, Yvonne, ed., *Approaches to teaching Ibsen's A Doll House*, New York, 1985, p. 32

৮. Rossi, Alice, ed., *The Feminist Papers: From Adams to De Beauvoir*, New York, 1973, p. 186

৯. Culler, Jonathan, *On Deconstruction : Theory and Criticism After Structuralism*, Ithaca, 1982, p. 86

১০. MacFarlane, James Walter and Orton, Graham, ed., *The Oxford Ibsen*, Trans., MacFarlane *et al.*, London, 1966, p. 436

১১. Templeton, Joan, *Ibsen's Women*, Cambridge, 1997, p. 125

১২. ibid, p. 126

১৩. Meyer, Michael, *Ibsen*, Garden City, 1971, p. 450

১৪. Hennings, Betty, *The New Spirit,* New York, 1890, p. 9

১৫. Templeton, Joan, ibid, p. 128

১৬. MacFarlane, James Walter and Orton, Graham, ed., ibid

১৭. Kelly, Joan, *Women, History, and Theory : The Essays of joan Kelly,* Chicago, 1984, p. 52

১৮. Gilman, Charlotte Perkins, *Woman and Economics*, New York, 1898, p. 263

১৯. Gilbert, Sandra and Gubar, Susan *The Madwoman in the Attic : The Woman Writer and the Nineteenth-Century, Literary Imagination,* New Haven , 1979, p.60

২০. Rich, Adrienne, *Of Woman Born : Motherhood as Experience and Institution,* London,,1976

২১. Badinter, Elizabeth, *Mother Love : Myth and Reality,* New York 1981

শামসুর রাহমানের কবিতা : চতুরাঙ্গিক জীবন-ভাবনা

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী*

শামসুর রাহমান সে সমস্ত কবির একজন যিনি কবিতার সঙ্গে 'লত্কা লত্কি করে'[১] দেখে ফেলেছেন জীবনের অপার রহস্য। অনুধ্যানে, রোমন্থনে এবং সংবেদনায় তাঁর একাত্মতা বিস্ময়কর। তিনি কবিতা লেখেন জীবনের পৃষ্ঠার পরে দাঁড়িয়ে। হয়তো সেটি 'খুকির' ফুল্কি-তোলা রুমালের মত অথবা 'টিনের বাক্সে' রক্ষিত লাল ফিতে ও ক্ষুদ্র পুঁটুলির মধ্যে নিভৃত শৈশব। তাঁর শিশিরগুলো মোলায়েম আবেগে শীত-মাখা। তাঁকে নির্বিকার স্মৃতিবাহী বর্ণনাময় আত্মগত মানুষ মনে হয় কখনো। কখনো বা তিনি করতালি মুখরিত সার্কাসের নিচে নিরানন্দ জীবনের রহস্য-উন্মোচনকারী। বাস্তবিক, রাহমানের জীবন তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার বৈচিত্র্যের স্মারক, প্রান্তময় পথের চিহ্নায়ক। এ রচনায় তাঁর কবিতায় বিধৃত জীবন-চেতনার স্বরূপ আলোচনা করা হল।

শামসুর রাহমানের কবিতায় বিধৃত জীবন চারটি স্তরে নির্ণিত হতে পারে। প্রথমত কবির শৈশব ও নাগরিক জীবনের রূপায়ণে মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক জীবন ; দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন উঠে এসেছে, নাগরিক অভিযোজিত মানুষের দূরতম নস্টালজিক চেতনায় দিনাতিপাত ও ভাসমান মানুষের বৈপরীত্যায়ন, তৃতীয় পর্যায়ের জীবনচিত্র পাওয়া যায় কবির অধীত বিদ্যার আন্তর্সংশ্লেষণে পুরাণ-প্রতীতীজাত জীবন এবং শেষ পর্যায়ে সংগ্রামকর্ষিত মানুষের প্রতিবাদ, অর্থাৎ জাতীয় জীবনের ঘটনাবলির প্রতীকায়িত জীবন। আসলে শামসুর রাহমান চল্লিশের দশকের পুরনো ঢাকার জীবনকে টেনে নিয়ে এসেছেন আধুনিক আজকের রাজধানী ঢাকার ঘূর্ণিত জীবনে। সেখানে রাহমানের বেতো ঘোড়া নেই বটে , নেই সহিসের হিস হিস শব্দ কিংবা আস্তাবলে খড়ের গম্বুজে ঘুমানো অবেলার জোব্বাঅলা একজন।[২] তাঁর ধ্যানী চোখ একটি অর্দ্ধ শতাব্দীর কাব্যচর্চার অভিজ্ঞতায় স্থির মীমাংসায় পৌঁছায়।

১. *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)* কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই শামসুর রাহমান কবিতার সঙ্গীতে সুর তোলেন। জীবনানন্দ-অভিনিবেশ এ পর্যায়ে তাঁকে আলোড়িত করলেও মুখ্যত তিনি এ গ্রন্থেই কবিতার 'রূপালি স্নান'টি সেরে ফেলেন[৩]। যদিও 'সন্ধ্যা-নদীর আঁকাবাঁকা জলে মেঠোচাঁদ লিখে রেখে যায় কোন গভীর পাঁচালি'—

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনানন্দীয় আবহকে মনে ধরায় তবু শামসুর রাহমান শান্ত রূপালি স্বর্গ-শিশিরে স্নানরত থাকেন। আর দেখেন নিম্ন-মধ্যবিত্তীয় প্রাত্যহিক শাহরিক জীবনের একজনকে—

শুয়ে আছে একজন নিরিবিলি ভোরের শয্যায়।
শীত-গোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন
শিথিল শরীর তার লেগে আছে ফ্যাকাশে চাদরে,
দেয়ালে আলোর পরী। খোলা দরজা।[৪]

বোঝা যায় রাজধানী ঢাকার প্রাক-নগরায়ন পর্ব এটি। পঞ্চাশের মেদুর, শান্ত, স্থবির সময়ের জীবনচিত্র। একঘেঁয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রাত্যহিক জীবন। ঘোড়া এবং সহিসের হিস হিস শব্দ মাঝে মাঝে সেই নাগরিক জীবনকে চঞ্চলতা দিলেও আস্তাবলের সহিসের অবসন্ন নিদ্রাটিও সেই জীবনেরই উৎসারিত প্রতিস্বর।

আস্তাবলে ফিকে অন্ধকার, ঝুলছে নিষ্কম্প স্তব্ধতা
আর সেই বেতো ঘোড়াটা অনেক্ষণ থেকে ঝিমুচ্ছে
নিঃশব্দে কোনো আফিমখোরের মতো।[৫]

এই আফিমখোরের মতো ঝিমন্ত বেতো ঘোড়ার ঝিমুনির পাশাপাশি তার মনিব সহিসের অবস্থাটিও লক্ষযোগ্য—

হলদে খড়ের শয্যায় বুড়ো সহিস ঘুমিয়ে আছে সেখানে
ক্লান্ত দেহে, নিঃসন্তান, বিপত্নীক —নিদ্রিত
কাঠের নক্সা যেন অবিকল।[৬]
(সেই ঘোড়াটি)

আসলে নিঃসন্তান, সঙ্গীহীন কাঠতুল্য একটি সময়ের জীবনকেই শামসুর রাহমান তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় তুলে এনেছেন। কবি যেন সেসবের সরল বর্ণনাকারী একজন। দেখছেন আর লিখে রাখছেন। এরি মধ্যে তাঁর বেড়ে-ওঠার পর্বটিকেও তিনি চিহ্নিত করেন। পুরনো ঢাকার বর্ণনায় যেমনই তিনি স্মৃতিমেদুর, তেমনি দুঃখাশ্রয়ী—

খুকীর পুতুল রানী এবং খোকার পোষমানা
পাখিটার ডানা
মুখ-বুঁজে থাকা
সহধর্মিনীর শাদা শাড়ির আঁচলে দুঃখ তার
ওড়ায় পতাকা।[৭]

আবার কখনো এই দুঃখবোধ তাঁর আত্মজীবনীর ঢঙে শৈশব বর্ণনায় প্রকাশিত হয়—

মা'কে দেখি। আজো দেখি কী এক মায়ায়
পাখি তার হাতে থেকে স্নেহের খাবার খেয়ে যায়

দুবেলা আবেগ ভরে। দেখি তসবি গুণে
সন্ধ্যার মিনারে[৮]

এই পর্বে শামসুর রাহমান যে জীবন-দ্রষ্টা সেটিকে তিনি রোমান্টিক অনুষঙ্গে প্রকাশ করেন। কোথাকার কোন বাঁশিঅলা অথবা, সহিসের ধারে-কাছের মাতাল তাড়িসেবক, টিনের বাক্সে খুকুর পুতুল রানী, পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ সেসবের বর্ণনায় তিনি অবিরল কথক—

রৌদ্রের দস্যুতা জেনে বৃষ্টির আঁচড়ে
মুহ্যমান দুঃখের দর্পণে দেখে মুখ
বাসি রুটি
চিবোয় অভ্যাস বশে জ্যোৎস্না-জ্বলা দাঁতে[৯]

এই প্রাত্যহিক চিত্রের সঙ্গে অভিযোজিত হয় আরব্য রজনীর কিছুটা আমেজও। নিচের দৃষ্টান্তটি লক্ষযোগ্য —

একতাল শূন্যতায় ভাবে
বেহেস্তের হুরি যায় কশাই চামার
ছুতোর কামার আর
মুটে-মজুরের ঘরে আর দরবেশের গুহায়
বাদশার হারেমে সুন্দরী বাঁদি যদি
বিলাসের কামনার খাদ্য হয়[১০]

শামসুর রাহমানের কবিতার জীবনচিত্রের এই সূত্রানুসন্ধানে তাঁর মানসগঠনের কাল-পরিক্রমার একটি চৌম্বক পর্যালোচনা আবশ্যক। কারণ বাংলাদেশের কবিতার চল্লিশের প্রথম আয়োজনটির অব্যবহিত পরের পঞ্চাশের দশকের প্রস্তুতির বিষয়টিও এ চেতনার মধ্যে বিধৃত।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতার প্রধান উদ্দিষ্ট হয়ে ওঠে নতুন রাষ্ট্র-কাঠামোর সঙ্গে শিল্পিসত্তার এক বিরলতম অভিজোজন-স্পৃহা, যেটি এ নতুন ভূখণ্ডের জন্য হবে আলাদা বৈশিষ্ট্যসূচক। বস্তুত চল্লিশের কবিরা এ বোধ থেকেই কাব্যরচনা শুরু করেন। আর এ বোধ বাঙালি মুসলমানের জন্য নতুন প্রেরণার সূচনা করে। কারণ দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে বিভাজিত রাষ্ট্র-কাঠামোয় বাঙালি মুসলমানের পুনরুত্থান সম্ভবপর হবে (যেটির সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের শুরুতে ভারত বিভক্তির পূর্বকালে)—এ বোধ অনেকের মধ্যেই ছিল ক্রিয়াশীল। কারণ বিগত শতাব্দীতে যে সাহিত্য-কাব্যকলার সৃষ্টি হয় তার প্রধান রূপকার ছিলেন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ। কিন্তু অচিরেই এর মোহমুক্তি ঘটে। কারণ পাকিস্তান-শাসিত পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ প্রথমেই অনুভব করল তার অস্তিত্বের সঙ্কট। আর এর প্রথম অভিঘাত অনুভূত হয় ভাষা-সম্পর্কিত চেতনায়। বাঙালি অনুধাবন করল আত্মত্যাগের আবশ্যকতা — যার

অনিবার্য পরিণাম ছিল বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন। অতঃপর ৫৪-এর নির্বাচন, যুক্তফ্রন্টের গঠন, আইয়ুবী কালোদশকের সূত্রপাত(১৯৫৮) ইত্যাদি ঘটনাবলির তরঙ্গক্ষুব্ধ অভিঘাত বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে সৃষ্টি করল প্রবল সংশয়, দ্বিধা ও যুগপৎ সংগ্রামীবোধের। এ পরিস্থিতির আলোড়ন চলেছিল সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও। পাকিস্তান-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশ যাঁরা সামন্ত মানসিকতা পোষণ করতেন তাঁরা পূর্বতন মনোভাবকেই সাহিত্যে নবতর উদ্যোগে রূপায়ণের চেষ্টা চালালেন। সুতরাং তাঁরা চাইলেন বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন ধারাকে বাদ দিয়ে ইসলামি চেতনা ও পুঁথি সাহিত্যের আদলে জীবনাদর্শের রূপায়ণ। সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদ প্রমুখ এ ধারায় বিশিষ্ট হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকিস্তান-পরবর্তী আবির্ভূত কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ-শ্রেণীর মনোভাবের দেখা গেল চরম অসঙ্গতি। তাঁরা মূলত বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও প্রগতিশীল চেতনায় শিল্পসাহিত্যকে প্রধাবিত করার চেষ্টা করলেন। আর ইউরোপীয় মানবতা ও নন্দনতত্ত্বে স্থিতধী হলেন। সুতরাং সাহিত্যাঙ্গনেও সৃষ্টি হল মতদ্বৈধতা। অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকেই বাংলাদেশের কবিতা পাকিস্তানি বা ইসলামি ভাবধারা এবং মানবতাবাদী ধারা, চেতনাগতভাবে এই দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর শামসুর রাহমান শেষোক্ত ধারারই একজন স্বনিষ্ঠ কাব্যসাধক।

২. আবাল্য নাগরিক কবি শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় নগরকেই আরাধ্য করে তুললেন। এর 'কারণ প্রধানত ত্রিবিধ : প্রথমত বস্তু পৃথিবীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, কেননা তিনি ছিলেন সেই শহরেরই আবাল্য অধিবাসী; দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের কবিতা এতে হয়ে উঠেছিল মূল তিরিশের নাগরিক কবিতা কিংবা বিশ্বকবিতার সমীপবর্তী এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশের কবিতার শরীর থেকে তিনি ঝরিয়ে দিতে চাইছিলেন অনাধুনিক গ্রামীণতার অপবাদ।[১১] আর কাব্যবোধে তিরিশোত্তর কবিদের মতো ইঙ্গ-মার্কিন চেতনায় পরিস্নাত হয়েও, বোদলেয়ার-নিবিষ্ট পাঠক হওয়া সত্ত্বেও শামসুর রাহমান মূলত দেশজ জীবন-সংশ্লেষী কবি। কেননা 'শামসুর রাহমান বুঝেছিলেন আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ, ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু আত্ম-আবেগের সঙ্গে পরিপার্শ্বের কোনো মিল খুঁজে পান না তিনি। কেননা নাগরিকতা বা পাশ্চাত্যের আধুনিকতাবাদের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত ছিল না বাংলাদেশে।[১২] আর এ জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে রাহমান কবিতায় রূপায়িত করেন তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন-সংশ্লেষী চেতনার। যা তাঁর নাগরিক অভিযোজিত মানুষের দূরতম নস্টালজিক চেতনায় দিনাতিপাত ও ভাসমান মানুষের বৈপরীত্যায়নে সৃষ্ট এক ধরনের আত্ম-বর্ণনা। তবে এর সঙ্গে আছে স্মৃতিময়তা, পারিপার্শ্বিকের মেদুর বর্ণনচিত্র ও বৈপরীত্যায়ন। 'খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি'[১৩] কবিতায় নাগরিক মানুষের পরিপাটি রোমান্টিক বর্ণনায় সমান্তরাল ভাসমান জীবনের এক প্রতিসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। কতিপয় দৃষ্টান্ত :

১. বড়ো রাস্তা, ঘুপচি গলি ঘিঞ্জি বস্তি, ভদ্রপাড়া আর
ফলের বাজার ঘুরে খেলনার দোকানের সামনে,
দাঁড়ালাম। কাচের আড়ালে দেখি কাঠের পুতুল,
রেলগাড়ি, ছক-কাটা, বাড়ি, আরবী ঘোড়া এক জোড়া,
উড়ন্ত পাখির মতো এরোপ্লেন, টিনের সেপাই।
ভালুক বাজায় ব্যান্ড, বাঁকা-শিং হরিণের পাশে
বাঘের অঙ্গার জ্বলে, বিকট হা করে আছে সিংহ ঃ
সারি সারি রয়েছে সাজানো ওহো হরেকরকম
বাজনা বাঁশি বাদশা বেগম আর উজির নাজির।
আমার পিরান নেই, পাগড়ি নেই লালমুখো সেই
উজিরের মতো, নাগরা নেই পায়।

২. ডেপুটি হাকিম নই, নই কোনো ভবঘুরে কবি;
পথের গোলাম আমি, বুঝেছো হে, অলীক হুকুমে
চৈত্ররাতে ফুটপাতে শুই। ঠ্যাং দুটি একতারা
হয়ে বাজে তারাপুঞ্জে, মর্মরিত স্বপ্নের মহলে
বাউলের কথামৃত স্বপ্ন হয় আমের বাউল।

৩. যে লোকটা সারাদিন পাখি বেচে গড়েছে সংসার,
হলুদ পাখির মতো যার বউ সে কেন গলায়
পরে ফাঁস?

উপর্যুক্ত ১-সংখ্যক দৃষ্টান্তে নাগরিক ফানুস-সর্বস্ব বাস্তবতার বিপরীতে ভাসমান প্রাকৃত মানুষের জীবনচিত্রের ব্যঞ্জনাত্মক প্রকাশ ঘটেছে। খেলনার দোকানের আপাতনগর পরিচ্ছন্নতা এবং কৃত্রিমতায় যে জীবন চিত্রিত সেটি অবক্ষয়িত সামন্ত জীবনের শেষ বর্ণচ্ছটা। কাচের আড়ালে কাঠের পুতুল, রেলগাড়ি, আরবি ঘোড়া, টিনের সেপাই, বাদশা বেগম, উজির নাজির প্রভৃতি অনুষঙ্গ আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের কথা স্মরণ করায় যার রেশ ধরে পঞ্চাশের নাগরিকতার মঞ্চায়নের যাত্রা শুরু। আর তাই নাগরিক জীবনের ভাসমান মানুষের সঙ্গে এ ঐতিহ্যের উপাদান অনুপস্থিতির বিবরণ প্রকটিত 'আমার পিরান নেই, পাগড়ি নেই লালমুখো সেই উজিরের মতো, নাগরা নেই পায়' এরকম বাক্যবন্ধে। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে এ-ভাসমান ভিখিরির মনোবেদনা আত্ম-মীমাংসায় পৌঁছায় একধরনের শিল্পবোধে। কারণ স্বাপ্নিকতা ও চলমানতায় তার জীবন অর্থবহ মনে হয় তখন, যখন সে বলে—'ঠ্যাং দুটি একতারা হয়ে বাজে তারাপুঞ্জে, মর্মরিত স্বপ্নের মহলে/ বাউলের কথামৃতে স্বপ্নে হয় আমের বাউল।' কিন্তু এ নতুন রাষ্ট্রের নির্মাণ-কাঠামোও একই কবিতায় উঠে আসে ভিখিরির

মনোকথনে—'দেশকে নতুন করে গড়ে পিটে নিতে/ চেয়েছে হুজ্জত সব জ্বলন্ত জোয়ান।'[১৪] শেষ দৃষ্টান্তে পাখিঅলার জীবনচিত্রের ভয়ানক বিয়োগান্তক দিক উন্মোচিত হয়েছে এ বিপরীত-ভাষে। পাখি-বিক্রেতার আর্থসামাজিক বাস্তবতায় পাখিতুল্য তার দাম্পত্য জীবনের পরিহাস যেন চরণদুটিতে প্রতিতুলিত হয়েছে। নাগরিক জীবনের অন্তরালে এই যে বিপরীত জীবনচিত্র সেই রূপটিই উঠে এসেছে শামসুর রাহমানের এ পর্বের কবিতাগুলোতে। পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ, একটি মৃত্য-বার্ষিকী, খেলনার দোকানে ভিখিরি, শনাক্ত পত্র, শৈশবের বাতিঅলা আমাকে, জনৈক সহিসের ছেলে বলেছে, পিতলের বক, কখনো আমার মাকে, দৃশ্যপট আমি এবং অনেকে, কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি প্রভৃতি কবিতায় তাঁর নাগরিক মধ্যবিত্তসুলভ অভিযোজিত মানুষের পাশাপাশি ভাসমান নগরেরই মানুষের প্রতিচিত্র বিম্বায়িত হয়েছে কবিচিত্তের রোমান্টিক স্বভাবে। এ সঙ্গেই এসেছে কবির শৈশবচেতনা, প্রত্যক্ষ নাগরিকবাস্তবতা, প্রজন্মগত দ্বন্দ্বের অভিঘাত। এ প্রবংশগত দ্বন্দ্ব শামসুর রাহমানের বহু-ব্যবহৃত কবিচৈতন্যের প্রতীক ঘোড়া ও সহিসের ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়। যেমন—

ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে, আমি একা
খড়ের গাদায় শুয়ে ভাবি
মুমূর্ষু পিতার কথা, যার শুকনো প্রায়-শব প্রায়-অবাস্তব
বুড়োটে শরীর
কিছুকাল ধরে যেন আঠা দিয়ে সাঁটা বিছানায়।[১৫]

বোঝা যায়, পুরনো ঢাকার সহিসের জীবনচিত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রবংশগত কারণে এ-সহিস চলে যাচ্ছে জীবনের উপান্তে, তারই সন্তান ভাবছে সেই ঘোড়ার কথা যাকে তার পিতা জীবিকার অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজ জীবন বদলেছে। গতস্য জীবনের সঙ্গে সূচিত হয়েছে মোটরযান ও বিকল্প যানের ব্যবস্থা এবং নাগরিক যন্ত্রশিল্প। কারণ আজ আর

রাজা-রাজড়ার দিন নেই আর ছাপার হরফে
কত কিছু লেখা হয়, কানে আসে। ছোটো-বড়ো সব
এক হয়ে যাবে নাকি আগামীর সখের নাটকে।[১৬](ঐ)

ফলে সহিস পিতাকে 'গতায়ু হবেন যিনি আজ কিংবা কাল/অথবা বছর ঘুরে' তাকে বড়ো দুর্বোধ্য ঠেকে পুত্রের।—

তাঁকেই ভাবছি যিনি ঘোড়াকে জরুর মতো ভালোবেসেছেন
আজীবন। মুমূর্ষু পিতার চোখে তরুণ ঘোড়ার
কেশরের মতো মেঘ জমে প্রতিক্ষণ। মাঝে-মাঝে
তাঁকে কেন যেন
দুর্বোধ্য গ্রন্থের মতো মনে হয়, ভাষা যার আকাশ-পাতাল

এক করলেও, মাথা খুঁড়ে মরলেও
একবর্ণ বুঝি না কখনও।[১৭] (ঐ)

সুতরাং এ জেনারেশন-বদলের বাস্তবতায় সহিসের ছেলে আর তার প্রবংশের জীবিকায় আস্থা রাখতে পারে না। কারণ তার স্বপ্নে ঘোড়া নয়, বরং নতুন জীবিকার আলোড়ন—

অথচ আমার স্বপ্নে রহস্যজনক ঘোড়া নয়,
কতিপয় চিম্‌নি, টালি, ছাদ, যন্ত্রপাতি; ফ্যাক্টরির
ধোঁয়ার আড়ালে ওড়া পায়রার ঝাঁক
এবং একটি মুখ ভেসে ওঠে, আলোময় মেঘের মতই
একটি শরীর
আমার শরীরে মেশে[১৮]

এ নাগরিক বর্ণনায় কবিচিত্তের দহনটিও পাওয়া যায়। কারণ যে নগর-মনস্ক কবিমানস, তার আছে সামাজিক দায়বোধ। তীব্র মানবিক-সংবিত্তি তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয় শ্রেণী-বৈষম্যে। প্রত্যক্ষ নগর-জীবন বর্ণনায়, মধ্যবিত্তমানসের সেই অন্তর্দহন—

১. দ্রুত পথ হাঁটতে গিয়ে কতদিন একটা টক টক গন্ধে উন্মন হয়ে
দেখেছ পথের পাশে হতচ্ছাড়া কোনো দোকানে
তন্দুরের ভেতর বিস্কুটগুলো একরাশ তারার মতো
জ্বলজ্বল করছে।[১৯]

২. ঘোর বর্ষায় বাসের হাতলে ঝুলতে ঝুলতে প্রকাণ্ড প্রত্যাশায়
পাড়ি জমিয়েছিলে কোনো শ্যামল পাড়ায়। মধ্যে-মধ্যে
বনোয়ারী দিনে রাধার হাসির মতো বিদ্যুৎ উঠতো ঝলসে। 'বেওয়ারিশ
ভাবনার মালিকানা কারুর একার নয়' বলে যে লোকটা
বেঠিক স্টপেজে পৌঁছে টলতে টলতে সংক্ষিপ্ত গলির মোড়ে
বাকাটা ঘুড়ির মতো লাপাত্তা, তার দিকে দৃষ্টি মেলে—
ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই, ভরা বাসে সামলে থাকুন, নয়তো
পা হড়কে যাবেন পড়ে বলে যে কন্ডাক্টার আউড়ে গেলো
কিছু অলৌকিক নাম—তার দিকে চেয়ে তুমি স্বপ্নের স্বত্বের কথা
ভাবছিলে।[২০]

উপর্যুক্ত ১-সংখ্যক দৃষ্টান্তে তন্দুরের ভিতরে অগ্নি-জ্বলজ্বলে বিস্কুট কবিআত্মার প্রতীক। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের বাসে ঝুলন্ত যাতায়াত যেন অনির্দেশ্য বৃত্তাবদ্ধ জীবনেরই প্রতীক-ভাষ। আর 'বেওয়ারিশ ভাবনার মালিকানা'-র উল্লেখে এক ভাসমান জীবনমানসের পরিচয় পাওয়া যায় এ শহরে যার স্থান-সংকুলনের অভাব এবং একটু অসতর্ক হওয়া মানেই জীবনপাতের সম্ভাবনা।

৩. ঐতিহ্য-সম্পৃক্ততা আধুনিক যুগ-চৈতন্যের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কবির কাছে এতিহ্য কখনও কেবল অতীত নয়, বরং সেটি তার অতীত ও ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতার রূপান্তরধর্মিতার অনিবার্য উপাদান। শামসুর রাহমান যেহেতু ইউরোপ-মনস্ক কবি তাই তাঁর ঐতিহ্যভাবনায় ক্রিয়াশীল কবির অধীত বিদ্যার অন্তর্সংশ্লেষ। আর এক্ষেত্রে তিনি যে জীবন-নির্মাণ করেন সেখানে ইকারুশ ডেডেলাস, ইলেক্ট্রারা বিচরণ করেন নতুন জীবনবোধের সঞ্চারক হিসেবে। তাঁর এ ঐতিহ্যচেতনা অবশ্যই তিরিশ-বাহিত বাংলা কবিতার সম্প্রসারণতায় নিবিষ্ট। 'শামসুর রাহমান শহুরে সামন্তলগ্ন অপুষ্ট বুর্জোয়া চৈতন্যে ধারণ করেন নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয় সত্তার চাঞ্চল্য, অথচ তিনি মিথ ব্যবহার করেন ব্যক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠার অভিলাষে, ব্যক্তির নির্ভরতা নির্দেশের লক্ষ্যে, মিথ বা পুরাণপাত্রে সমগ্র জাতির, যুগসংক্রান্তির ভাষ্যরচনা তাঁর লক্ষ্য নয়। ব্যক্তিচরিত্রপাত্র-জাতীয় মিথব্যবহার অবশ্য স্বদেশ ও অভিভাবক-শক্তির প্রতি কবির ভরসা ও নিবেদনকেই প্রতীকায়িত করে, যেমন টেলেমেকাস, ইকারুসের আকাশ, ডেডেলাস, চাঁদ সদাগর, রুস্তমের স্বগতোক্তি প্রভৃতি কাব্যচরিত্র কবির স্বপ্নাতুর রোমান্টিক মনের ও আত্মকীয়তার প্রতীক-চিহ্নিত।'[২১]

ইকারুসের আকাশ (১৯৮২) শামসুর রাহমানের পুরাণ-মনস্কতার উৎকৃষ্ট সংযোজন। মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আত্ম-চৈতন্যের উন্মীলনে আমরা রাহমানকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য পুরাণ-মগ্ন হতে দেখি আর সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত। এর উৎস তাঁর অধীত বিদ্যার অন্তর্জলি-রূপ। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়ে গেছে। যে স্বপ্ন আর চেতনায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় তার চেতনা প্রায় তিরোহিত। নতুন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আগামেমননের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। 'নিহত জনক, আগামেমনন, কবরে শায়িত আজ'। আর সে-কারণে স্বপ্ন আছে। আছে ইলেক্ট্রার ঐকান্তিক প্রতিশোধ-স্পৃহা স্বপ্নপুরাণের গান। কিন্তু সময় প্রতিকূল। প্রয়োজন আজ ওরেস্টেসের। তাই ইলেক্ট্রা আত্মগত গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে বাংলাদেশের জনকের মৃত্যুর প্রতিশোধ-স্পৃহা। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধে-অপারগ ইলেক্ট্রা আত্মবিলাপে পিতার শোককে ধারণ করে আছে। কারণ এজেস্থাসের শাসনামলে পিতার জন্য প্রকাশ্যে শোক করাও অপরাধ।

আড়ালে বিলাপ করি এক একা, ক্ষতার্ত পিতা
তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ[২২]

অথচ আগামেমননরূপী জনকের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন, স্বাধীনতার বিজয়-কেতন যেন ট্রয়ের বীরত্বগাথা—

সেইদিন আজো জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
বিজয়ী সে বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।[২৩]

শামসুর রাহমানের এ পুরাণ-প্রতীতীজাত জীবন আসলে একটি অবরুদ্ধ, নির্বাক, অশুভ শক্তির শাসনামলে ক্রান্তিকালের বাংলাদেশের মানুষের বাকরুদ্ধ উচ্চারণ।আর তাই তিনি গেছেন ঐতিহ্য-গাথায়, অধীত বিদ্যার পরিমণ্ডলে। 'ইকারুশের আকাশ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে কবির স্বাপ্নিক উচ্চারণের সঙ্গোপন আকুতি। ইকারুসরূপী কবিচৈতন্য আসলে শিল্পের স্বাধীন আকাশে সদম্ভে উড্ডয়নকামী। সেখানে মৃত্যুভয় তিরোহিত বরং পরাধীন চৈতন্য থেকে আত্মমুক্তি-প্রয়াসী। কারণ পিতার নিষেধের তর্জনীর মধ্যেই ছিল ইকারুসের পরিণাম। তথাপি সে জীবন মধুময়, প্রাপ্তিময় হলেও আত্মত্যাগেই বাঁচার সার্থকতা নিহিত। কারণ –

কখনো মৃত্যুর আগে মানুষ জানে না
নিজের সঠিক পরিণতি। পালকের ভাঁজে ভাঁজে
সর্বনাশ নিতেছে নিশ্বাস
জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্ত বলয়
পাখা মেলবার।[২৪]

রাহমানের পুরাণ-অন্বেষা এভাবেই তাঁর কবিতায় রূপায়িত হয় ব্যক্তি থেকে সামষ্টিক চৈতন্যে। কখনো বা লোকপুরাণের ব্যবহারও তাঁর কবিতায় সমকালীন বাস্তবতাকে তুলে ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় যদিও তা খুবই অপ্রতুল। 'চাঁদ সদাগর' কবিতাটি এমনি একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। এখানে কবির চম্পক নগর হয়ে ওঠে সমকালীন বাংলাদেশেরই নামান্তর। আর কবিচিত্ত আদর্শস্নাত, অমিত পুরুষকারের তেজস্বিতায় অনমনীয় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক তরুণ চাঁদ সদাগরের রূপ পরিগ্রহ করে—

যতদিন হিন্তাল কাঠের
লাঠি আছে হাতে, আছে
ধমনীতে পৌরুষের কিছু তেজ, যতদিন ঠোঁটে
আমার মুহূর্তগুলি ঈষৎ স্পন্দিত হবে, চোখে
নিমেষে উঠবে ভেসে কোনো শোভাযাত্রার মশাল,
করবো না আন্ধারের বশ্যতা স্বীকার ততদিন,
যতই দেখাক ভয় একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ,
ভিটায় গজাক পরগাছা বারংবার, পুনরায়
ডিঙার বহর ডোবে ডুবুক ডহরে শতবার,
গাঙুরের জলে ফের যাক ভেসে লক্ষ লখিন্দর।[২৫]

তবে শামসুর রাহমানের এ পুরাণ-পর্বটি সাময়িক। কবিচেতনার অন্তর্গূঢ় গুল্মপ্রদেশের অবদমিত বাকনির্মাণের প্রচেষ্টায় তাঁর এ পুরাণ অভিগমন। এ ছাড়া পঞ্চাশের আরো অনেক কবির মতই তিনি দ্রুত অনুপ্রবেশ করেন সামাজিক দায়বদ্ধ জীবনচেতনার প্রত্যক্ষ-উত্তাপময় কাব্যভুবনে। এ কথাও ঠিক তাঁর আন্তর্বিদ্যক বৈশিষ্ট্যে

নির্মিত এ সংক্ষিপ্ত জীবন অন্বেষার পর্বটিও তাঁকে করেছে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

৪. শামসুর রাহমান মূলত সে কবিদের একজন যিনি বাংলাদেশের কবিতায় বুর্জোয়া মানবিকতার সূত্রে দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। পূর্ববাংলার সমাজ-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল ভাষাআন্দোলন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশের কবিতার গতিপথ সুবিন্যস্ত ও বৈশিষ্ট্যসূচক করতে কবিদের ভূমিকার কথাও শুরুতে বলা হয়েছে। শামসুর রাহমানের কবিতা প্রথম থেকেই হয়ে পড়ে মানবিক দায়বদ্ধতার কবিতা হিসেবে। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* থেকে *নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮)* পর্যন্ত শামসুর রাহমানের কবিতার উত্তরণ অনেকটা নাগরিক স্মৃতি ও নির্বিকার বর্ণনারীতিতে বিন্যস্ত। তাঁর কবিতার মর্মমূল *'নিজবাসভূমে'* (১৯৬৮) পর্বে এসেই যুক্ত হয়ে পড়ে সামষ্টিক পরিব্যাপ্তিতে। আর এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় সমকালীন রাষ্ট্র-কাঠামোর নানা ঘটনাবহ আলোড়ন-আন্দোলন। এবং এ নতুন জীবন-ঘনিষ্ঠ চেতনা শামসুর রাহমানের কবিতায় নব্বইয়ের সূচনালগ্ন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের স্বৈরাচারবিরোধী নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত। এ-কারণেই বর্তমান আলোচনায় কবির এ-পর্বের জীবনচেতনা আহৃত হয়েছে— সংগ্রামকর্ষিত মানুষের প্রতিবাদ অর্থাৎ জাতীয় জীবনের ঘটনাবলীর প্রতীকায়িত জীবন হিসেবে। তবে এ জীবনচেতনায় অনুপ্রবেশ শামসুর রাহমানের কবিতায় আকস্মিক নয়। এর উৎস সন্ধানে তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা আবশ্যক।

সাতচল্লিশোত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনের মতো পূর্বপাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও শুরু হয়েছিল গভীর ষড়যন্ত্র। এবং এর প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ববঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতি এবং এককভাবে রবীন্দ্রবিরোধিতায়, এ কথা পূর্বে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। ভাষা-সংস্কৃতির অন্যতম বাহন বাংলা ভাষা নিয়েও সামরিক সরকার এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। রোমান হরফ প্রবর্তন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে আইয়ুবী শাসনের আরেকটা প্রচেষ্টা। 'একটি মাত্র ভাষা সৃষ্টি করে দেশের সংহতি মজবুত করার জন্য সামরিক সরকার প্রথম থেকে চেষ্টা চালায়। পরিকল্পনা ছিল বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে একটি ভাষা তৈরি করা ও সংশোধিত রোমান হরফে লেখা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে, সাংবাদিক সম্মেলনে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনায় আইউব খান সে-বিষয়ে ইঙ্গিত দেন।"[২৬] বাংলা একাডেমী সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে গঠন করে ভাষা-সংস্কার কমিটি। কমিটি বাংলা বর্ণমালা থেকে কতিপয় বর্ণ বর্জন করাসহ কিছু সুপারিশ করে। কিন্তু সরকারের এ-প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। অনেকের চোখে এটি বাঙালি জাতিসত্তার ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে পরগণিত হল।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদযাপন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে দ্বিধা-সংশয় এবং সন্দেহের জন্ম দিল। রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডিত করে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছড়ানোর অভিপ্রায়ে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানবাদের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করল। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নজরুল ইসলাম অধিক গ্রহণযোগ্য হলেন। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে এ বিতর্কের সূত্রপাত দেখা দিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত ইসলাম-পন্থী একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়কে কেন্দ্র করে। দৈনিক আজাদ ১লা বৈশাখ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করে: 'সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথের দোহাই তুলিয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুসারী ও ভক্ত। তাহাদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে নাই, তাহারা এই সুযোগে তামুদ্দীনক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে"[২৭] কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজ ও অগণিত রবীন্দ্রভক্তের উৎসাহে মফস্বলের বহু জায়গায় রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদযাপিত হতে থাকে। ঢাকায়ও কোথাও কোথাও বেশ জোরে-শোরে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে জনৈক মন্ত্রীর রবীন্দ্র-বিরোধী মন্তব্যে আবারো রবীন্দ্র বিতর্কের শুরু হয়। "১৯৬৭ সালের জুন মাসে পিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনের সময় পূর্ববাংলার সংস্কৃতি ও এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নিয়ে পরিষদের ভেতরে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে এক উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডা চলে। ক্রমে-ক্রমে সেটা পরিষদের বাইরে বুদ্ধিজীবী মহলেও প্রসারিত হয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে গুরুতর বিতর্কের সূচনা করে।"[২৮] এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলা বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও সচেতন জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ায় গঠিত হয় 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ"(১৯৬৭) । সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে সরকার রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্য থেকে সরে আসে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এ সাফল্য এ দেশের মুক্ত চিন্তার মানুষ ও বুদ্ধিজীবী মহলে এনে দেয় নতুন প্রাণাবেগ। পরবর্তীকালে এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী এবং রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামেরও উজ্জীবনী প্রাণশক্তির প্রতীক। মূলত শামসুর রাহমানের কবিতায় এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সামালোচকের কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়—'জাতীয় জীবনও এই সময় থেকে নানা ঘটনায় হয়ে উঠছিল উন্মুখর। হরতাল, বিক্ষোভ, রবীন্দ্র-বিতর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। শামসুর রাহমানের বিশেষত্ব হচ্ছে এইসব ঘটনাকে কবিতা করে তুলতে পেরেছিলেন।'[২৯] পরের বাক্যে কবির এ জীবনচেতনার স্বরূপ আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'এই কব্যচর্চার পটভূমি হিসেবে তিনি যথার্থভাবেই পেয়ে যান আধা ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্তবাদী সমাজের অন্তর্ভুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল এমন একটি দেশে ও তার

দেশবাসীকে, যার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলমুক্তির জন্য প্রতিনিয়ত লিপ্ত হয়ে পড়ছিলেন নানা সংগ্রাম ও আন্দোলনে। তিনি তাঁর কবিতায় একাধারে উপজীব্য করে তুললেন দেশের সঙ্কট, শাসকশ্রেণীর দমনপ্রক্রিয়া এবং জনতার উজ্জীবনী ভাবনাকে।'[৩০] আর কারণেই নিজবাসভূমেই রাহমানকে দেখা যায় অধিকতর সামষ্টিক প্রয়োজনে আত্ম-বিবরমুখিতাকে ত্যাগ করে জনতার সঙ্ঘ-উচ্চারণে মিশে যেতে। ভাষা-আন্দোলনের চেতনাই তাঁকে এ বোধে সম্পৃক্ত করে—

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে কী থাকে আমার?
উনিশ শো' বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।[৩১]

আর কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে জীবনের অন্য মাত্রা যার সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাড়ীর সংযোগ। আর আছে সাংগ্রামিক চারিত্র। কারণ কবির চতুষ্টয়ী জীবন-অন্বেষণে এও এক প্রান্ত—

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া পাল খাটানো হাওয়ায়
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে,[৩২]

সুতরাং জীবনের এ ঝাঁঝালো প্রান্তটিকে দেখা যাচ্ছে কবি স্পর্শ করছেন নবতর জীবনচেতনায়। সেখানে অপসৃত কবির পূর্বোক্ত নস্টালজিক চেতনার আত্মকথনের বর্ণনাময় মনোচিত্রভাষ। বরং এ পর্যায়ের জীবন-বীক্ষণের মধ্যে লক্ষ করা যায় ব্যঙ্গাত্মক মুড। রোমান্টিক চেতনার অনিবার্য অসহিষ্ণুতাই যেন উঠে এসেছে বর্ণনচিত্রে। এ পর্বে কবির বর্ণনারীতি একরৈখিক জীবনদ্রষ্টার মতো নয় বরং নগর-মনস্ক মধ্যবিত্তীয় মানসের প্রাত্যহিক জীবনচিত্রে দিনাতিপাত ও প্রাপ্তির একঘেঁয়েমি প্রকাশিত হয়েছে বর্ণনার বৃত্তাবদ্ধতায়—

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি;
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা

পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনে কথা শুনছি
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।[৩৩]

স্বাধিকার আন্দোলনে আলোড়িত হয়েছে রাহমানের কবিতা ; যার বীজ প্রোথিত হয়েছিল ভাষা-আন্দোলনের চেতনায়। বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রত্যাশা এবং যেন প্রার্থিত স্বাধীনতার অভাবে কবিকে আবারো কলম ধরতে হয়—

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডব দাহন?[৩৪]

বোঝা যাচ্ছে, কবির এ জীবনচেতনার একটি চলমান ও প্রাত্যহিক ভাষাবোধ শামসুর রাহমান আয়ত্ত করেছেন ইতোমধ্যে । এ চেতনা *নিজবাসভূমে (১৯৭০)* . *বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩)* প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাপকতা পেয়েছে এবং শামসুর রাহমান হয়ে উঠেছেন আরো সাম্প্রতিক ও সমকালীন। তাই এ-কথা বলা যায় শামসুর রাহানের কবিতায় সমকালীন জাতীয়জীবন এক অনিবার্য সঙ্ঘউচ্চারণ লাভ করেছে। কবির এ চেতনা স্বাধীনতা-উত্তরকালে কিছুটা শমিত হলেও আগ্রাসী রূপ লাভ করে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে। *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে (১৯৮৬), স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার (১৯৮৭), বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮)* প্রভৃতি কাব্যে শামসুর রাহমান বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম এই মূল্যবোধের শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করে, স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতাপ দেখে কবিও আহত—

বিবরে লুকিয়েছিলো যারা গির্জার ইঁদুর হয়ে
ইদানীং তারা বনবেড়ালের রূপে
তুমুল ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তির চাতালে,
যখন তখন
বসায় নখর দাঁত জায়মান সৌন্দর্যের গোলাপী গ্রীবায়।
... ...
এই উল্টোরথ দেখে, শপথ তোমার
প্রেমের, আমার আজ বড় বেশি দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে।[৩৫]

আর এ সূত্রেই রাহমানের কবিতা হয়ে ওঠে অধিকতর জনতা-সংলগ্ন, বৃহত্তর গণমানুষের কণ্ঠস্বর। নব্বইয়ের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েই রাহমান নূর হোসেনের আত্মত্যাগের মহিমাকে রূপায়িত করেছেন সমষ্টির ব্যাপ্তির নৈর্ব্যক্তিক রূপ—

উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে-পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান,

বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
শহরের টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয়[৩৬]

স্বৈরাচারী এরশাদ-বিরোধী চেতনায় সমকালীন স্বদেশ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বর্ণনায় তাঁর ভাষাভঙ্গিতেও এসেছে ব্যঙ্গাত্মক মুড। আসলে রূপক-প্রতিরূপকের মাধ্যমে কবি এক গণতন্ত্রহীন, কণ্ঠরোধ সময়কে তুলে ধরেছেন নিচের কবিতায়। স্বৈরাচার ও তার দোসরদের বর্ণনায় রাহমান আশ্রয় নেন রূপকী ভাষার—

পুতুল খেলার ভারি শখ তাঁর
পেছন থেকে সুতো নেড়ে, সুতো ছেড়ে
তিনি হর-হামেশা নিজের মেজাজটাকে শরিফ রাখেন।
পুতুলগণ তাঁর চারপাশ
মুড়ে দিয়েছেন শুভেচ্ছা, অনলস খেদমত আর অন্তবিহীন
তোষামোদে। তাঁর শাসনামল, একজন
পুতুলের জবানিতে, একটি নিখাদ স্বর্ণযুগ।[৩৭]

শামসুর রাহমানের কবিতা বাংলাদেশের রাষ্ট্র-কাঠামোর বিবর্তনে এভাবেই এ ভূখণ্ডের মানুষের জীবন-কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়। প্রথম পর্যায়ে রোমান্টিক স্মৃতিবর্ণনায় নিবিষ্ট কবি পরবর্তীকালে আমূল রূপান্তরিত হন সামষ্টিক মানুষের প্রাত্যহিক টানাপোড়নের রূপকার হিসেবে। আর তাঁর কবিতাও এ চতুরাঙ্গিক জীবন-প্রত্যয়ের মধ্যেই পেয়ে যায় এক সর্বৈব আবেদন। শামসুর রাহমানের কবিতা এ কারণেই প্রথম থেকে শেষাবধি এ জীবন-পরিক্রমা কবিচেতনার ইতিবাচক মর্যাদাপূর্ণ উত্তরণরূপেই পরগণিত হয়। এ ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান বাংলা কবিতায় একক, তুলনারহিত।

তথ্যপঞ্জি :

১. কাল সারারাত আমি কবিতার সঙ্গে অতিশয়
লত্‌কা লত্‌কি ক'রে কাটিয়ে দিয়েছি। বাতি জ্বেলে
দেখেছি উত্তুঙ্গ স্তন, নাভিমূল, শ্রোণী ; লজ্জা ফেলে
স্খলিত শাড়ির মতো কবিতা আমাকে, মনে হয়,
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ক'রে নিয়েছিলো কাল।
(কাল সারারাত, মাতাল ঋত্বিক, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২)

২. সেই ঘোড়াটা, *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*, ঢাকা, ১৯৬০
৩. রূপালি স্নান, প্রাগুক্ত
৪. তার শয্যার পাশে, প্রাগুক্ত
৫. সেই ঘোড়াটা, প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. দুঃখ, *রৌদ্র করোটিতে*, ঢাকা, ১৯৬৩
৮. আমার মা'কে, প্রাগুক্ত
৯. পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ, প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত
১১. *মাসুদুজ্জামান,বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ২৩৯
১২. প্রাগুক্ত
১৩. খেলনার দোকানে ভিখিরি, *রৌদ্রকরোটিতে*, ঢাকা, ১৯৬৩
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. জনৈক সহিসের ছেলে বলছে, *বিধ্বস্ত নীলিমা*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি, *নিরালোকে দিব্যরথ*, ঢাকা, ১৯৬৮
২০. প্রাগুক্ত
২১. বেগম আকতার কামাল, *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ ৪২
২২. ইলেক্ট্রার গান, *ইকারুসের আকাশ*, সব্যসাচী, ঢাকা, ১৯৮২
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. ইকারুসের আকাশ, প্রাগুক্ত
২৫. চাঁদ সদাগর, *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*, ঢাকা, ১৯৮২
২৬. সাঈদ-উর রহমান,প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
২৭. দৈনিক আজাদ

২৮. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ১০৪
২৯. মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ২৮০
৩০. প্রাগুক্ত
৩১. বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, *নিজবাসভূমে*, মাহতাবুন নেসা, ১৯৭০
৩২. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ , প্রাগুক্ত
৩৩. দুঃস্বপ্নে একদিন, প্রাগুক্ত
৩৪. তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, *বন্দী শিবির থেকে*, কলকাতা, ১৯৭২
৩৫. *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*, ঢাকা, ১৯৮৬
৩৬. *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*, ঢাকা, ১৯৮৮
৩৭. কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না, প্রাগুক্ত